কিশোর থ্রিলার

পৃথিবীর বাইরে

রকিব হাসান

কিশোর
মুসা
রবিন

তিন বন্ধু

কিশোর চিলার

পৃথিবীর বাইরে

রকিব হাসান

প্রজাপতি প্রকাশন

পরিচয়

প্রিয় পাঠক বন্ধুরা–
'তিন বন্ধু'র তরফ থেকে তোমাদের স্বাগতম।
আমি কিশোর পাশা বলছি।
নতুন যারা, আমাদের পরিচয় জানো না,
তাদের জানাই: আমি বাঙালী।
আমার এক বন্ধু মুসা আমান, আমেরিকান নিগ্রো।
অন্যজন রবিন মিলফোর্ড, আইরিশ আমেরিকান।
'তিন গোয়েন্দা' হিসেবে আমরা পরিচিত।
আমাদের মূল ঘাঁটি আমেরিকার রকি বীচে।
রহস্য ও অ্যাডভেঞ্চারের খাতিরে যে কোন জায়গা,
যে কোন শহর, যে কোন সময়ে, এমনকি যে কোন গ্রহেও
চলে যেতে পারি আমরা।
পুরানো পাঠকরা, দয়া করে 'চিলার'-এর সঙ্গে
'থ্রিলার'-কে গুলিয়ে ফেলো না।
এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা সিরিজ। এ বইয়ে মনে হবে
অনেক কিছুই উদ্ভট, অবাস্তব, অতিপ্রাকৃত।
কিন্তু কি প্রয়োজন চুলচেরা বাস্তব বিশ্লেষণের–
মজা পাওয়াটাই আসল কথা, তাই না?

এক

নতুন ক্লাসে বসে আছে কিশোর।

নতুন স্কুল।

নতুন ধরনের অনুভূতি। চারিদিকে চিৎকার-চেঁচামেচি, হট্টগোল, হাসাহাসি।

স্কুলের প্রথম দিনের মতই লাগছে।

চেয়ার টানাটানি। দড়াম করে লকারের দরজা লাগানো। ছেলেমেয়েদের হাঁকডাক। স্বাগত জানানো। সবার মুখেই হাজারও প্রশ্ন। কে কোথায় বসবে। কি করবে। কার সীট কোনটা।

অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। উত্তেজিত হয়ে আছে স্নায়ু। পেটের মধ্যে এক ধরনের ভারী অনুভূতি। অবাক লাগছে ওর। স্কুল কখনও উত্তেজিত করে না ওকে। বরং ভাল লাগে। এক ধরনের শান্তি। সেটা প্রথম দিন হলেও।

তৃতীয় সারির একটা ডেস্কে বসেছে সে। ডেস্কের ওপর রাখা বইয়ের স্তূপ। পাঠ্যবই। চকচকে। নতুন।

ক্লাস টীচার এলেন। খাটো, গাট্টাগোট্টা একজন মানুষ। লাল চুল। গম্ভীর মুখ। চোখে ভারী ফ্রেমের কালো কাঁচের চশমা । পরনে বাদামী রঙের ঢোলা প্যান্ট। গায়ে সাদা শার্ট।

সামনে ঝুঁকে হাঁটেন। যেন পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে ঝোড়ো বাতাস। হাঁটার তালে তালে ঝাঁকি খায় লাল চুল।

তাড়াহুড়ো করে যার যার সীটে গিয়ে বসতে শুরু করল ছেলেমেয়েরা। হট্টগোল থামছে না ওদের। কারও দিকে তাকালেন না তিনি। গটমট করে হেঁটে গেলেন ঘরের সামনের দিকে রাখা তাঁর ডেস্কের উদ্দেশে। হাতের কাগজের বোঝা শব্দ করে ফেললেন তার ওপর। চোখ থেকে চশমা খুলে রুমাল দিয়ে কাঁচ মুছতে শুরু করলেন।

জোরে জোরে ঘণ্টা বাজল। ইলেকট্রনিক ঘণ্টার শব্দ ছড়িয়ে পড়ল উঁচু জানালাটার মাথা থেকে সারা ঘরে।

দু'চারজন ছেলেমেয়ে কথা বলছে তখনও। বাকি সবাই চুপ। তাকিয়ে আছে টীচারের মুখের দিকে।

'আমি মিস্টার ডরি,' জানালেন তিনি। ভারী কণ্ঠস্বর।

অবাক লাগল কিশোরের। তার মনে হলো এই উচ্চতার একজন মানুষের তুলনায় স্বরটা অনেক বেশি জোরাল।

অস্বস্তি বোধটা যায়নি এখনও তার। চারপাশে তাকাল।

ছেলেমেয়েদের দিকে।

মুখ থেকে মুখে ঘুরে বেড়াতে থাকল তার দৃষ্টি।

ঘাড়ের পেছনে শিরশিরে অনুভূতি।

এ সব ছেলেমেয়েরা কারা?

ওদের চিনতে পারছে না কেন সে?

প্রতি বছরই নতুন নতুন ছেলেমেয়ে ভর্তি হয় স্কুলে। তারা অচেনা হতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগই তো পরিচিত হওয়ার কথা।

তার পরিচিত সবাই অন্য ক্লাসে গিয়ে বসেছে, এ হতেই পারে না। অসম্ভব।

আর এ ক্লাসের সবাইও নতুন হতে পারে না।

মুখ থেকে মুখে ঘুরছে তার দৃষ্টি। সব নতুন, সব। সবাই অপরিচিত।

ভুল ক্লাসে ঢুকে পড়ল নাকি?

ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। পকেট থেকে ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট কার্ড বের করে দেখল। লেখা রয়েছে: কিশোর পাশা। মিস্টার ডোরি'স ট্রিলথ্ গ্রেড।

কি গ্রেড!

মাথাটা আরও গরম হয়ে যাওয়ার জোগাড় হলো। এ রকম কোন গ্রেডের কথা তো জীবনে শোনেনি।

সারির শেষ মাথায় জানালার কাছে বসেছে একটা মেয়ে। বেশ সুন্দরী। রোদ পড়ে তার সোনালি চুলগুলো সোনার মত জ্বলছে। মাথা নিচু করে কি যেন লিখছে।

তার পাশে বসা লম্বা একটা ছেলে। সুঠামদেহী। মাথায় লাল রঙের বেজবল ক্যাপ। চোখে চোখ পড়তে হাসল।

ছেলেটা কি তার পরিচিত? ভাবল কিশোর। সত্যি তার দিকে তাকিয়ে হাসল? নাকি অন্য কারও দিকে?

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের সারির দিকে তাকাল কিশোর। ওখানে পরিচিত কেউ আছে কিনা দেখল। চেনা মুখ দেখলে খুশি লাগত।

উঁহু। কেউ নেই। সব অপরিচিত।

'নতুন ক্লাসে স্বাগতম,' গমগম করে উঠল মিস্টার ডোরির কণ্ঠ। খাটো ডেস্কটার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ডেস্কের ওপর দুই হাতের তালু রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে।

মনে মনে হাসল কিশোর। ছোটখাট একটা গরিলার মত লাগছে টীচারকে। লালচুলো গরিলা।

'আশা করি ছুটিটা ভালই কেটেছে তোমাদের,' বললেন তিনি। চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে সবার মুখের দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁর দৃষ্টি। 'আশা করি নতুন ক্লাস ট্রিলথ্ গ্রেডের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারবে এবার।'

হাত তুলল কিশোর। 'কি বললেন, স্যার?' জিজ্ঞেস না করে পারল না সে। 'কোন্ গ্রেড?'

দুই

সামনের সীটে বসা একটা ছেলে চিউয়িং গাম চিবুচ্ছিল বোধহয়। বিষম খেল সে। এমন ভাবে খোঁত-খাঁত শুরু করে দিল, কিশোরের প্রশ্নটাই চাপা পড়ে গেল।

ক্লাসের বেশির ভাগ ছেলেমেয়েকে সেদিকে ঘুরে যেতে দেখল কিশোর। মিস্টার ডোরির নজর সরে গেল তার দিক থেকে। বিষম খাওয়া ছেলেটার কাছে গিয়ে তার পিঠে চাপড় মেরে তাকে স্বাভাবিক করতে ব্যস্ত হলেন।

'নতুন ক্লাসে এসেই বিষম খাওয়া শুরু করলে তোমরা,' রসিকতা করলেন টীচার।

দু'একটা ছেলে হেসে উঠল। বেশির ভাগই হাসল না।

টকটকে লাল হয়ে গেছে বিষম খাওয়া ছেলেটার মুখ। তবে ঠিক হয়ে গেছে সে। বসে পড়ল চেয়ারে। বিব্রত। মেঝের দিকে চোখ।

নিজের অজান্তেই দুই হাতে ডেস্কের কিনার চেপে ধরেছিল কিশোর। সরিয়ে আনল। ভারী দম নিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করল স্নায়ুগুলোকে।

এত উত্তেজিত হয়ে আছে কেন সে?

অত দুশ্চিন্তার কিছু নেই কিশোর, নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল সে।

এ দিকে পেছন করে চক-বোর্ডে লিখতে শুরু করেছেন মিস্টার ডোরি। চকের তীক্ষ্ণ কিঁচকিঁচ শব্দ অসহ্য লাগছে।

কি লিখছেন?

সামনে ঝুঁকে চোখমুখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে কিশোর। বোঝার চেষ্টা করছে।

কিছুই পড়তে পারছে না।

বিদেশী কোন বর্ণমালা। অদ্ভুত আঁকিবুকি মনে হচ্ছে কিশোরের কাছে।

নতুন কোনও বর্ণমালা আবিষ্কার করলেন নাকি তিনি? কোন ধরনের শর্টহ্যান্ড? নাকি খেলা?

বার কয়েক চোখ মিটমিট করল সে। লেখাগুলোকে স্পষ্ট করে দেখার জন্যে। কিছুই বুঝতে পারল না।

বাক্য লিখছেন, না নম্বর লিখছেন মিস্টার ডোরি, কিছুই বোঝা গেল না।

হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেছে কিশোরের। চাঁদিতে চাপ দিচ্ছে রক্ত। পেটের মধ্যে খামচে ধরা অনুভূতি।

ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাল সে। ওরা সব লেখা পড়তে পারছে, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কেউ কেউ নোটবুকে টুকে নিচ্ছে।

ওরা বুঝছে, আমি বুঝতে পারছি না কেন? ভাবছে কিশোর।

থামলেন মিস্টার ডোরি। ডাস্টার দিয়ে শেষের কিছুটা মুছে দিলেন। ডেস্কে রাখা কাগজের লেখা পড়লেন। আবার বোর্ডের দিকে ফিরে লিখতে শুরু করলেন।

কিঁচ-কিঁচ! কিঁচ-কিঁচ!

চকের শব্দ লোম খাড়া করে দিচ্ছে কিশোরের।

কেন পড়তে পারছে না?

স্বপ্ন দেখছে?

হ্যাঁ। স্বপ্নই। এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা।

দুঃস্বপ্ন।

নিজের বাহুতে চিমটি কাটল সে। জোরে।

ব্যথা পেল। স্বপ্নটা কাটল না। জেগেও উঠল না।

তারমানে স্বপ্ন নয়।

আবার তাকাল বোর্ডের দিকে। পড়তে পারল না এবারেও।

লেখা থামিয়ে ঘুরে তাকালেন মিস্টার ডোরি। গোলাপী রঙের মাংসল হাত দিয়ে থাবা মেরে ফেলে দিলেন শার্টের বুকে লেগে থাকা চকের গুঁড়ো। ডেস্কে রাখা একটা কাগজের দিকে তাকালেন। মুখ তুললেন ছেলেমেয়েদের দিকে।

কিশোরের দিকে তাকালেন। 'কিশোর পাশা,' ভারী গলায় ডাকলেন, 'এসো তো। সমীকরণটার সমাধান করে ফেলো।'

তিন

ঢোক গিলল সে।

লাল হয়ে যাচ্ছে মুখ।

অদ্ভুত অক্ষরগুলোর দিকে তাকাল আরেকবার কিশোর। ঘামছে।

'কি হলো, এসো,' চকটা সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন মিস্টার ডোরি। 'সমীকরণটা করে ফেলো।'

'অ্যাঁ···উম্···' রীতিমত কাঁপ উঠে গেছে কিশোরের।

স্কুলের প্রথম দিন। আর প্রথম দিনেই তাকে একটা গরু ভাববে ছেলেমেয়েরা।

'এটা আমি করতে পারব না, স্যার,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিশোর। 'মিসেস ক্রেন্ডলের ক্লাসে এ জিনিস পড়ানো হয়নি আমাদের।'

'কে?' বলে উঠল তার পেছনে বসা একটা মেয়ে। 'কার ক্লাসে?'

ঘুরে তাকাল কয়েকটা ছেলে। কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকাতে লাগল সোনালি চুলওয়ালা মেয়েটা।

'কেউ পারবে?' ক্লাসের দিকে চকটা তাক করে ধরে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ডোরি। 'সমীকরণটা করতে পারবে কেউ? আমি তো ভাবলাম সহজ একটা দিই, যাতে যে কেউ করে ফেলতে পারো।'

সহজ! ভাবছে কিশোর। ঠাট্টা করছেন নাকি ভদ্রলোক?

সামনের সারির কোঁকড়া কালো চুলওয়ালা একটা মেয়ে হাত তুলল। মিস্টার ডোরি মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালে উঠে গিয়ে চকটা নিল তাঁর হাত থেকে। তাঁর দুর্বোধ্য আঁকিবুকিগুলোর নিচে আরও আঁকিবুকি আঁকতে লাগল।

তিন লাইন দুর্বোধ্য অক্ষর লিখে চকটা ফিরিয়ে দিল মিস্টার ডোরির হাতে।

ওর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। মৃদু হাসি খেলে গেল গোলগাল মুখে। 'ভেরি গুড, নয়িতা।' সোজা তাকাতেই চোখ পড়ল কিশোরের মুখে। হাসিটা মলিন হয়ে গেল তাঁর।

কিশোর লক্ষ করল, আরও অনেকেই বার বার তাকাচ্ছে ওর দিকে।

কান, ঘাড় গরম হয়ে উঠতে লাগল তার।

ঘটনাটা কি? ভুলটা কোনখানে? ওই লেখাটা পড়তে পারার কথা নাকি তার?

আসলেই কি ট্রিলথ্ গ্রেডে পড়ে সে?

নাকি টীচারের কথা ভুল শুনেছে?

পুরো ব্যাপারটা নিয়ে এত গভীর ভাবনায় ডুবে গেল, এরপর কি বললেন মিস্টার ডোরি, কিছুই কানে ঢুকল না তার।

বাস্তবে ফিরে এল যখন সমস্ত ছেলেমেয়েরা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। সীট থেকে সরে এসে পেছনের দেয়ালের সামনে সারি দিয়ে বসানো কম্পিউটারগুলোর দিকে রওনা হলো।

'আমি জানি, কাজটা অনেকেরই পছন্দ হবে না,' মিস্টার ডোরির কথা কানে এল কিশোরের। 'কিন্তু তারপরেও, লিখতে থাকো। প্র্যাকটিসটা অন্তত হোক।'

কি লিখবে?

কি লেখার কথা বলেছেন শুনতে পায়নি কিশোর।

টলমল ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সে। পা কাঁপছে।

নাহ্, ক্লাসের শুরুটা আজ মোটেও সুখকর হয়নি তার জন্যে।

মন শক্ত করো, নিজেকে আদেশ দিল সে।

এত বেকায়দায় জীবনে পড়েনি। বিশেষ করে স্কুলে। কোনও বিষয়েই তেমন আটকায় না সে।

আজ এমন হলো কেন?

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে গিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে আঙুল ঢুকিয়ে দিল দাঁতের ফাঁকে। আঙুল কামড়াতে গিয়ে কামড় খেল জিভে। ব্যথা পেয়ে 'আঁউক' করে অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এল। কম্পিউটারের লম্বা টেবিলটার এক মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কয়েকটা ছেলেমেয়ে। না দেখার ভান করল কিশোর।

জিভে কামড় লাগলে প্রচণ্ড ব্যথা লাগে। যার লেগেছে সে বুঝতে পারবে। জিভের ক্ষত জায়গাটায় যেন হুল ফুটানো শুরু হলো। কোনমতে গিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসে পড়ল সে।

পাশের ছেলেটার দিকে তাকাল। সামনে ঝুঁকে কীবোর্ডে টাইপ শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে ছেলেটা। ফিসফিস করে তাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'মিস্টার ডোরি কি লিখতে বলেছেন?'

কীবোর্ড থেকে হাত না সরিয়েই ঘুরে তাকাল ছেলেটা। বলল, 'এই গ্রীষ্মে তোমার জীবনে মজার কি ঘটেছে সে-সম্পর্কে লিখতে হবে।' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'প্রতি বছর নতুন ক্লাসে এলে সেই একই বিষয়। অন্য কিছু যেন ভেবে বের করতে পারে না।'

মুচকি হাসল কিশোর। 'করতে পারে। খারাপ কিছু ঘটেছে কিনা জিজ্ঞেস করতে পারে হয়তো...'

কিন্তু তার দিকে নজর নেই আর ছেলেটার। কম্পিউটারের সাদা চকচকে পর্দার দিকে তাকিয়ে আবার টাইপ শুরু করেছে।

নিজের মনিটরের দিকে তাকাল কিশোর। গত গ্রীষ্মে মজার কি ঘটেছে ভাবতে লাগল। একটা কথাও মনে করতে পারল না।

ভাবতে ভাবতেই কীবোর্ডের দিকে তাকাল। আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল চেয়ার থেকে।

অক্ষর! কীবোর্ডের অক্ষর। চিনতে পারছে না সে। এ রকম চেহারার বর্ণমালা জীবনে দেখেনি।

তাকিয়ে রইল কীগুলোর দিকে। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।

তার দুই পাশে বসা সব ছেলেমেয়েরা টাইপ করে চলেছে।

কাঁধে হাত পড়তে চমকে গেল কিশোর। শক্ত করে চেপে বসল কাঁধের আঙুলগুলো।

ফিরে তাকাল সে। মিস্টার ডোরি এসে দাঁড়িয়েছেন পেছনে। শূন্য মনিটরের দিকে একবার চোখ ফেলে ভুরু কুঁচকে তাকালেন কিশোরের

দিকে। মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন সমস্যা হয়েছে, কিশোর?'

'অ্যাঁ···আঁ' জবাব খুঁজে পাচ্ছে না কিশোর। 'আমি···ইয়ে···'

'লেখার মত কিছুই কি মনে করতে পারছ না?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ডোরি। 'পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাতে যাওনি এবারের গ্রীষ্মে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'গেছি। কিন্তু···'

'কোথায় গিয়েছিলে?'

কিশোর জবাব দেবার আগেই হাত বাড়িয়ে মাথার ওপরে দেয়ালে ঝোলানো একটা বিশাল ম্যাপ টান দিয়ে নামিয়ে দিলেন তিনি। 'কোথায় গিয়েছিলে, দেখাও তো এখানে।'

মুখ তুলে ম্যাপের দিকে তাকাল কিশোর।

অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে।

এটা কোন ধরনের ম্যাপ?

একটা দেশও তার পরিচিত নয়। উত্তর আমেরিকা কোথায়? কোথায় দক্ষিণ আমেরিকা? ইউরোপ?

এত সাগরই বা এল কোত্থেকে?

উল্টো করে রাখা হয়েছে নাকি ম্যাপটা? উঁহু। তা-ও তো না। তা ছাড়া উল্টো করে রাখলেই কি আর অচেনা লাগে।

ম্যাপটাই ঠিক না। এ রকম ম্যাপ আর কখনও দেখেনি সে।

ভারী কাঁচের ওপাশ থেকে চোখ সরু করে ওর দিকে তাকালেন মিস্টার ডোরি। 'কি হয়েছে, কিশোর?'

বলবে নাকি? বলে দেবে?

জানাবে মিস্টার ডোরিকে, সমস্যাটা কি ওর?

তিনি কি বুঝবেন? নাকি ওর মাথা খারাপ ভেবে বসবেন?

ভাবেন ভাবুনগে। বলেই ফেলল, 'মিস্টার ডোরি, আমার মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। কিছুই মাথায় ঢুকছে না।'

ক্লাস শেষের ঘণ্টা বাজল। ঠিক মাথার ওপরে। এতটাই চমকে গেল কিশোর, মনে হলো দশ হাত শূন্যে লাফিয়ে উঠেছে।

মিস্টার ডোরির প্রশ্নবাণ থেকে এবারও বেঁচে গেল কিশোর।

'যাও সবাই,' মিস্টার ডোরি বললেন। 'লাঞ্চের পর আবার দেখা হবে।'

চেয়ার টানাটানির শব্দ। হাসি। জোরাল কথাবার্তা।

মিস্টার ডোরি কিশোরের শেষ কথাটা শুনতে পেলেন কিনা বোঝা গেল না। ঘুরে, দ্রুতপায়ে হেঁটে চলে গেলেন ডেস্কের কাছে।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। ঘোর লেগে আছে যেন মগজটার মধ্যে। শরীর কাঁপছে।

চকবোর্ডে আঁকা অদ্ভুত আঁকিবুকিগুলোর দিকে তাকাল আরেকবার। ধীরপায়ে রওনা হলো হলের দিকে।

কি হয়েছে ওর? বুঝতে পারছে না।
এমন কেউ কি আছে, যে এই ধাঁধার জবাব দিতে পারবে?

চার

খিদে মরে গেছে কিশোরের। তবু লম্বা হলওয়েটা ধরে হেঁটে চলল। কোন কিছুই পরিচিত লাগছে না। দেয়ালগুলো কি রকম সবুজ। এ রকমই ছিল নাকি গরমের ছুটি হওয়ার আগে? লকারগুলো কোথায়?

লাঞ্চরুমে ঢুকে আবার চারপাশে তাকাতে শুরু করল পরিচিত মুখ দেখার আশায়। একটাও চোখে পড়ল না। সব অপরিচিত। তার মনে হতে লাগল সবাই অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে ওর দিকে। দু'একজন কথাও বলার চেষ্টা করল। বিশেষ করে সেই সোনালিচুল মেয়েটা। এমন সব প্রশ্ন করল, বুঝতেই পারল না কিশোর। শেষে এড়িয়ে যাওয়ার ভান করল।

পাশের টেবিলে বসা একটা ছেলেকে স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল কিশোর। ওভাবে তাকিয়ে আছে কেন? কোন কিছু সন্দেহ করেছে নাকি সে?

চারদিক থেকে এ ভাবে শ্যেন দৃষ্টির মধ্যে বসে থাকতে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। লাঞ্চ প্যাকেটটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। বাইরে গিয়ে খাবে।

বেরিয়ে এল বাইরের তাজা বাতাসে। ঝলমলে রোদ। আবহাওয়া গরম। মনেই হয় না গরমকাল শেষ হয়ে গেছে।

হাঁটতে শুরু করল সে। টীচারদের পার্কিং লট পেরিয়ে এল। সামনে মাঠ। একপাশে এক চিলতে খোলা জায়গার পর শুরু হয়েছে বন।

মনে হলো বনের মধ্যে গেলে শান্তি পাবে। তা-ই করল। ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে। লম্বা ঘাস। ঝোপঝাড়। তারমধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল সে। বনটাও অচেনা। অচেনা সব গাছপালা। এ কোথায় এল?

অপরিচিত এক ধরনের নলখাগড়ার মত গাছ দেখা গেল। বাতাসে নুয়ে পড়ছে মাথা। ঢুকে পড়ল তার মধ্যে।

নলখাগড়ার বন পার হয়ে আসতেই বিচিত্র একটা অনুভূতি হলো তার। সজাগ হয়ে উঠল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। মনে হলো, আড়াল থেকে কেউ নজর রাখছে তার ওপর।

হঠাৎ কানে এল পায়ের শব্দ।

ঘাবড়ে গেল সে। কেউ কি তাকে অনুসরণ করছে?

কে করবে?

শিক্ষকরা?

ক্লাসের অপরিচিত ছাত্রছাত্রীরা?

কেন করবে?

ফিরে তাকাল। কাউকে চোখে পড়ল না। ঢুকে পড়ল আবার পাইন গাছের মত এক ধরনের লম্বা গাছের জঙ্গলে।

একটা ঝোপের দিকে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল। ঝোপ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত একজন মানুষ। এত বেঁটে, বামনই মনে হয়। মাথায় হালকা রোঁয়ার মত চুল। কান দুটো খাড়া। ওপরের দিকটা চোখা। সবচেয়ে অবাক করার মত হলো ওর চামড়ার রঙ। পাতার মত সবুজ। গাছপালা কিংবা ঝোপ ঘেঁষে দাঁড়ালে চট করে চোখে পড়বে না।

একটা সেকেণ্ড চুপচাপ দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল মানুষটা। এমন ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল, যেন মিলিয়ে গেছে বাতাসে।

চোখ ডলল কিশোর। ভুল দেখল নাকি?

যা-ই দেখুক, ওখানে থাকার সাহস হলো না আর। উল্টো দিকে ঘুরে দৌড়াতে শুরু করল। বেরিয়ে যেতে চায় এই ভুতুড়ে বন থেকে।

নলখাগড়ার বন পেরিয়ে এল। ঝোপ ঘুরে এগোতে গিয়ে ধাক্কা খেল একটা ছেলের গায়ে। ঘাসের ওপর পড়ে গেল দু'জনে।

চিৎকার করে উঠল দু'জনেই।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে পড়ল আবার। মুখোমুখি হলো।

সেই ছেলেটা। লঞ্চরুমে দেখা। তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

চোখের পাতা সরু করে ছেলেটা বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার, কিশোর।'

দ্রুত চারপাশে তাকাল কিশোর। কোনও ফাঁদ কিনা, বোঝার চেষ্টা করল। জিজ্ঞেস করল, 'কি কথা?'

পাঁচ

'আমার মনে হচ্ছে,' ছেলেটা বলল, 'তুমি এখানে আর সবার চেয়ে আলাদা।'

ধড়াস করে উঠল কিশোরের বুক। ধরা পড়ে গেছে! কি করে বুঝল ছেলেটা? নাকি সে যে আলাদা সবাই বুঝে গেছে তার আচরণ থেকে? টীচার মিস্টার ডোরিও বুঝেছেন?

ঢোক গিলে কোনমতে জিজ্ঞেস করল, 'কি নাম তোমার? আমার পিছু

নিয়েছ কেন? কি করেছি আমি? আমার নামই বা জানলে কি করে? ক্লাসে তোমাকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না?'

'আস্তে, আস্তে,' হাত তুলল ছেলেটা। 'আমার নাম রবিন। তোমার নাম জেনেছি ডাইনিং রুমে তোমাকে ওই নামে ডাকতে শুনে।'

রবিনের নাম শুনে কোন রকম ভাবান্তর হলো না কিশোরের। 'আমার পেছনে লেগেছ কেন?'

'কারণ তুমি এখানে আর সবার চেয়ে আলাদা,' জবাব দিল রবিন।

'কি করে বুঝলে?'

'তোমার আচরণে।'

যা ভেবেছিল তাই, ভাবল কিশোর। ঠিকই ধরা পড়ে গেছে। তারমানে রবিন যখন বুঝেছে, আরও অনেকেই বুঝেছে।

'আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' তার মনের কথা বুঝতে পেরে যেন বলল রবিন। 'আমিও তোমারই মত।'

মিথ্যে বলছে না তো?

চালাকি করে তার আসল পরিচয়টা জেনে নিতে চাইছে না তো? কিন্তু তার আসল পরিচয় কি? সে নিজেই তো জানে না।

কিশোরকে জবাব দিতে না দেখে রবিন বলল, 'সত্যি আমি ওদের মত নই। বিশ্বাস করো।'

গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল কিশোর। 'ক্লাসে তো দেখলাম না তোমাকে? কোথা থেকে এলে তুমি?'

মাটির দিকে চোখ নামাল রবিন। 'ছিলাম ক্লাসেই। অন্য কোন শাখায়। কোথা থেকে এসেছি, জানি না। মনে করতে পারছি না।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'মিথ্যে বলছ?'

'না!'

'সত্যিই মনে করতে পারছ না কোথা থেকে এসেছ?'

'না।' চোখ তুলে তাকাল রবিন। 'এমনকি আমার পুরো নামটা কি, তা-ও মনে করতে পারছি না।'

'তাই?' রবিনের মুখের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'তুমি কি এখানকার স্থানীয়?'

'আমি?...আমি...' জবাব দিতে পারছে না কিশোর। কোনখান থেকে এসেছে, সে-ও জানে না।

ঘটনাটা কি?

মনে করতে পারছে না কেন?

বিড়বিড় করে জানাল, 'আমিও মনে করতে পারছি না।

পা কাঁপতে শুরু করল। মাথার মধ্যে চক্কর দিয়ে উঠল। ধপ করে বসে পড়ল ঘাসের ওপর। হেলান দিল গাছের গায়ে।

চোখ মুদে ভাবতে লাগল। মনে করার চেষ্টা করল।

কোথায় বাড়ি ওর? কোনখান থেকে এসেছে?

মনে করতে পারছে না কেন?

'ভীষণ ভয় লাগছে আমার,' রবিন বলল। 'স্কুলের কাউকে চিনি না। ওদের বর্ণমালা বুঝি না।'

'আমিও না,' চোখ মেলল কিশোর।

'সকালে কি ভাবে স্কুলে এসেছি, কি করেছি, কিছুই মনে নেই,' রবিন বলল। 'খালি মনে আছে, স্কুলে ডেস্কের সামনে টীচার আসার অপেক্ষায় বসে আছি আমি।'

'বলো কি! আমারও তো একই অবস্থা!'

জবাব দিতে যাচ্ছিল রবিন। কিন্তু থেমে গেল। কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। আচমকা চিৎকার করে উঠল, 'ওরা কারা?'

ফিরে তাকাল কিশোর। ঝোপের মধ্যে ঢুকে যেতে দেখল কয়েকটা সবুজ বামনকে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। চিৎকার করে বলল, 'চলো চলো, এখানে আর এক মুহূর্তও না! এই বনটাও ভাল ঠেকছে না আমার!'

বন থেকে বেরোতেই মাঠের মধ্যে দেখা হয়ে গেল কয়েকটা ছেলেমেয়ের সঙ্গে। খেলছিল ওরা। কিশোরদের দেখে খেলা থামিয়ে থমকে দাঁড়াল। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ওদের মাঝে লাল ক্যাপ পরা সেই ছেলেটা আর সোনালিচুল মেয়েটাকেও দেখতে পেল কিশোর।

এগিয়ে এসে দু'জনকে ঘিরে দাঁড়াল ছেলেমেয়েরা। চেহারা থমথমে।

'ওখানে ঢুকেছিলে কেন?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। 'জানো না, স্কুল খোলার দিনে ওখানে ঢোকা নিষেধ?'

'আমরা...আমরা এই একটু নিরিবিলিতে কথা বলতে গিয়েছিলাম,' আমতা আমতা করে জবাব দিল কিশোর।

'কিন্তু জানো না বনটা কি রকম বিপজ্জনক? নিয়ম-কানুন জানো না কিছু?'

না, জানি না, ভাবল কিশোর। এ স্কুলের কোন কিছুই জানি না আমরা।

চারপাশ থেকে ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে ছেলেমেয়ের দল।

'আর কোন উপায় নেই আমাদের। বিচারের মুখোমুখি তোমাদের হতেই হবে। নইলে আমরা শাস্তি পাব,' মেয়েটা বলল। 'এসো আমাদের সঙ্গে।'

'কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর।

'প্রিনসাপলের কাছে,' জবাব দিল নয়িতা। 'মিস্টার ক্রেটার। এখানকার নিয়ম হলো, কাউকে ওই বনে ঢুকতে দেখলেই তাঁর কাছে রিপোর্ট করতে হবে।'

'কিন্তু...' বলতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর।

'না জানালে কৈফিয়ত দিতে হবে আমাদের,' আরেকটা ছেলে বলল। 'তোমরা কি চাও, তোমাদের দু'জনের জন্যে আমরা সবাই বিপদে পড়ি?'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। কোন উপায় দেখতে পেল না। ছেলেমেয়েদের পিছু পিছু স্কুল বিল্ডিঙের দিকে হাঁটতে শুরু করল ওরা। সামনের দিকের একটা অফিসে নিয়ে আসা হলো ওদের।

ধূসর সুট পরা একজন মানুষকে দেখা গেল অফিসে। বয়েস চল্লিশের কোঠায়। রোদে পোড়া গালের চামড়া। উজ্জ্বল নীল চোখ। ধূসর হয়ে আসা চুলের ঠিক মাঝখানে সিঁথি করা। মিস্টার ক্রেটার।

রবিন আর কিশোরকে পেছনের আরেকটা অফিসে নিয়ে গেলেন তিনি। দরজা লাগিয়ে দিলেন। তাঁর লম্বা ডেস্কটার সামনে বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু'জনে।

উজ্জ্বল নীল চোখের পাতা সরু করে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার ক্রেটার। চুলে এত তেল দিয়েছেন, তীব্র আলোর নিচে চিকচিক করছে।

প্রিনসাপল অচেনা লোক। গত বছর তাঁকে দেখেনি কিশোর।

মিস ডেনভারকেই চিরকাল এখানে প্রিনসাপল হিসেবে দেখে এসেছে।

তবে এখানে কথা আছে। স্কুলটা কি সেই স্কুলটাই?

মনে করতে পারছে না কেন?

রোদেপোড়া চোয়ালের চামড়া ডললেন মিস্টার ক্রেটার। তারপর ঘুরে তাকালেন কিশোরের দিকে। 'বনে ঢুকেছিলে নাকি তোমরা?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ঢুকেছিলাম।'

বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটানো শুরু করেছে হৃৎপিণ্ডটা। হাতের তালু ঘামছে। প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল সে।

'দু'জনেই বনের মধ্যে ঢুকেছ?' রবিনের দিকে তাকালেন তিনি।

দ্বিধা করতে লাগল রবিন। 'হ্যাঁ...মানে...'

মাথা দুলিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললেন মিস্টার ক্রেটার, 'দু'জনেই তোমরা মস্ত অপরাধ করেছ। শাস্তিটাও জানা আছে তোমাদের। আর কিছু বলবে?'

ছয়

হাঁটু ভাঁজ হয়ে আসতে শুরু করল কিশোরের। দুই হাতে ডেস্কের কিনার খামচে ধরে পতন ঠেকাল।

ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল রবিনের মুখ থেকে।

মাথাটা পেছনে হেলিয়ে বাঁকা চোখে তাকালেন প্রিনসাপল। ভাবলেন কিছু। তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, 'ঠিক আছে, প্রথমবারের মত মাপ করে দিলাম, যাও। তবে ভবিষ্যতে এ ভুল আর করবে না কখনও।'

যাক, বাঁচা গেল! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। আবার স্বাভাবিক হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস।

ভ্রূকুটি করলেন মিস্টার ক্রেটার। 'কিন্তু তোমরা ভাল করেই জানো, স্কুলের সময় বনে ঢোকা নিষেধ। কি করতে গিয়েছিলে?'

সত্যি কথাটা বলে দেয়ার জন্যে মন আনচান করে উঠল কিশোরের। বলতে ইচ্ছে করল: কোথা থেকে এসেছি আমরা, কিছুই জানি না, মিস্টার ক্রেটার। এ স্কুলের কাউকে চিনি না। আপনাদের বর্ণমালা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য।

কিন্তু সত্যি কথাটা বলতে পারল না কিশোর। তার মন বলছে, সত্যি কথা বললে আরও অনেক বেশি বিপদে পড়বে।

'বনের ধারে এক অদ্ভুত জীবকে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখেছি আমরা, মিস্টার ক্রেটার,' বলল সে। 'ওটার পিছু নিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম।'

'অদ্ভুত অনেক প্রাণীই আছে বনের ভেতর,' মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন মিস্টার ক্রেটার। 'সে-জন্যেই তো ওখানে ঢোকা বারণ।'

'আসলে, স্কুলের প্রথম দিন তো,' রবিন বলল। 'মনে ছিল না।'

চেয়ারে বসলেন মিস্টার ক্রেটার। একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কিশোরের দিকে।

'কিশোর,' বললেন তিনি, 'শুনলাম, ক্লাসে অতি সাধারণ একটা সমীকরণও নাকি করতে পারোনি তুমি। কম্পিউটারে কিছু লিখতে পারোনি। ম্যাপের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলে। কারণটা কি, জানতে পারি?'

ঢোক গিলল কিশোর। গলার ভেতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে। জবাব দেবার আগে অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব জেনে নিতে ইচ্ছে করল তার: কোন স্কুল এটা? শহরটার নাম কি? বোর্ডে কোন বর্ণমালায় লিখেছিলেন মিস্টার ডোরি? সে নিজে তার পুরো নামটা জেনেছে কার্ড দেখে, আর কিছু কেন মনে করতে পারছে না? কোথায় বাড়ি, কোথায় থাকে কেন মনে করতে পারছে না? রবিনেরও একই অবস্থা। কেন?

কিন্তু প্রশ্নগুলো করতে পারল না। মাথা নিচু করে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'হুঁ, বুঝলাম, টীচারের সঙ্গে বেয়াড়াপনা করেছ। প্রথম প্রথম অনেক ছেলেই এ রকম করে। তবে আমি একবারই সহ্য করব, দ্বিতীয়বার আর না। যাও, এখন ক্লাসে যাও!' অফিসের বাইরে দু'জনকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন মিস্টার ক্রেটার। 'আর কোন দুষ্টুমি করবে না, ঠিক আছে? তোমরা এখন ট্রিলথ ক্লাসের ছাত্র। বড় হয়েছ। ভেবেচিন্তে কাজ করা উচিত তোমাদের

যাতে নিচের ক্লাসের ছেলেরা তোমাদের দেখে শিখতে পারে।'

ট্রিলথ! আবার সেই উদ্ভট শব্দ। যার কিছুই জানে না ওরা।

হলওয়ে ধরে পাশাপাশি হেঁটে চলল সে আর রবিন। লকার বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে আসছে। বইখাতা বের করে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে যার যার ক্লাসে দৌড়াচ্ছে ছেলেমেয়েরা।

লকারের সামনে এসে দাঁড়াল রবিন। ফিসফিস করে বলল, 'বড় ভয় লাগছে আমার।'

নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'আমারও।'

জানালার বাইরে একটা নিচু দেয়াল। তার ওপাশে খেলার মাঠ। দেয়ালের ওপর উঁকি দিল একটা মাথা। নিচু স্বরে ডাকল, 'অ্যাই, শোনো।'

ফিরে তাকাল কিশোর আর রবিন। ওদেরই বয়েসী আরেকটা ছেলেকে মাথা তুলে রাখতে দেখল। কালো চামড়া। মাথায় কোঁকড়া তারের মত চুল খুলি কামড়ে আছে।

পেছনে কয়েকটা ছেলেমেয়েকে কথা বলতে বলতে আসতে শুনে সাহস হারাল দু'জনে। এখানে সব কিছুতেই যেন বিপদ। আবার কোন্ বিপদে পড়ে, সে-জন্যে দেয়ালের বাইরের কালো ছেলেটার দিকে তাকাল না আর। দ্রুতপায়ে রওনা হলো ক্লাসের দিকে।

সাত

বড় ধীরে কাটল বাকি দিনটা। সারাক্ষণ নিজের সামনে বসা ছেলেটার আড়ালে মুখ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করল কিশোর, যাতে তার ওপর নজর না পড়ে মিস্টার ডোরির। তিনি কি পড়াচ্ছেন, কি বোঝাচ্ছেন, কিছুই মাথায় ঢুকছে না তার।

ভূগোল পড়ানোর সময় আফ্রিকা মহাদেশের ওপর আলোচনা করলেন তিনি। কান খাড়া করে থাকল কিশোর। ভুল করে আফ্রিকার উচ্চারণ আফ্রিকা শুনছে নাকি সে? না, ভুল শুনছে না।

তারপর তিনি লেখক হাইমেন থাউস-এর লেখা উপন্যাসের প্রথম তিন চ্যাপ্টার পড়ে শোনাতে লাগলেন।

এ রকম কোন লেখকের নাম শোনেনি কিশোর। কি পড়াচ্ছেন মিস্টার ডোরি, কিছু বুঝতে পারছে না। মাথার মধ্যে সব শূন্য হয়ে যাচ্ছে। ঘুরতে শুরু করেছে মাথা। চিন্তা করতে পারছে না ঠিকমত। কখন আবার রীডিং পড়ার জন্যে ধরে বসেন মিস্টার ডোরি, এই ভয়ে অস্থির।

তার পরে শুরু হলো খিদের অত্যাচার। পেটের মধ্যে পাক দিতে শুরু

করেছে। লাঞ্চের সময় কিছু খায়নি।

ঘড়ির দিকে তাকাল সে। মনে হলো পেছনে ঘুরছে কাঁটাগুলো। নম্বরগুলো অচেনা। দুর্বোধ্য। ক'টা বাজল বোঝা মুশকিল। তা ছাড়া বারোটা নম্বরের জায়গায় রয়েছে চোদ্দটা।

রবিনের কি অবস্থা? ভাবল সে। সে এ ক্লাসে নেই। অন্য কোন 'ট্রিলথ' ক্লাসে রয়েছে হয়তো।

একটা কথা ভাবতে হঠাৎ আতঙ্কে অবশ হয়ে আসতে লাগল হাত-পা। রবিন তার সঙ্গে চালাকি করেনি তো? সে হয়তো এখানকারই কেউ, তার মত আলাদা নয়। কোনও ধরনের ফাঁদ পাতেনি তো?

সত্যি কি ওকে বিশ্বাস করা যায়?

বড় করে দম নিল কিশোর। না ছেড়ে ফুসফুসেই আটকে রাখল দমটা। আতঙ্কিত হয়ো না, নিজেকে বোঝাল সে। ফাঁদ নয়। প্রিনসাপলের ঘরে রবিনও তারই মত আতঙ্কিত হয়ে ছিল। ওটা অভিনয় হতে পারে না।

কাউকে না কাউকে তো বিশ্বাস করতেই হবে।

শেষ বেলটা যখন বাজল, হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কিশোর।

তাড়াহুড়ো করে বেরোতে শুরু করল সবাই। হাসাহাসি। ঠেলাঠেলি। রসিকতা। সবাই সুখী। কেবল কিশোর আর রবিন বাদে।

ক্লান্ত লাগছে কিশোরের। খিদে। অতিরিক্ত উত্তেজনা। সব কিছু মিলিয়ে কাহিল করে দিয়েছে। বুঝে গেছে, এ রকম করে আর একটা দিনও স্কুলে কাটাতে পারবে না। সে এখানকার কেউ নয়।

কিন্তু কি করবে?

রবিনকে লকারের কাছে অপেক্ষা করতে দেখল। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে মুখ। চোখে মুখে অস্থিরতা। ফিসফিস করে বলল, 'চলো কোথাও। কথা আছে।'

বইগুলো লকারে ছুঁড়ে ফেলে জ্যাকেটটা বের করে নিল কিশোর। রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'দুপুরের পরে কেমন কাটল?'

'ভয়াবহ,' গলা কাঁপছে রবিনের। 'টীচার কি পড়ালেন, কিছুই বুঝতে পারিনি। মিস কারিনুয়া একটা বই থেকে জোরে জোরে পড়তে বললেন আমাকে। একটা বর্ণও পড়তে পারিনি। পুরোপুরি দুর্বোধ্য।'

'তারপর কি করলে?'

'কাশার অভিনয় শুরু করলাম। কাশতে কাশতে প্রায় বেহুঁশ। কিন্তু রোজ তো আর কাশি দিয়ে ঠেকাতে পারব না।'

খেলার মাঠ পেরোনোর সময় দেখল, খেলছে ছেলেমেয়েরা। দুই দলে ভাগ হয়ে সিডির মত দেখতে দুটো রূপালী রঙের ডিস্ক ছোঁড়াছুঁড়ি করছে।

প্রতিবার লুফে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠছে। তুমুল হট্টগোল আর কোলাহল।

'মিনিয়ার হয়েছে,' চিৎকার করে বলল একটা ছেলে। 'ডাবল মিনিয়ার।'

'মিনিয়ার না। একেবারেই আউট,' তর্ক করতে লাগল একটা মেয়ে।

'না, ডাবল মিনিয়ার!'

'কিন্তু ও তো স্ক্রোগ মাড়াল!'

বেধে গেল ঝগড়া। খেলা বন্ধ। দুটো ছেলে মাথার ওপর ডিস্ক ছুঁড়তে লাগল অলস ভঙ্গিতে। মীমাংসা হওয়ার অপেক্ষা করছে।

'স্ক্রোগ মাড়ালে মিনিয়ার হবে না!'

'হবে। স্ক্রেম করা উচিত ছিল।'

'প্রয়োজন ছিল না। স্ক্রেম বদল করে দিয়েছিলাম।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের ঝগড়া দেখল কিশোর আর রবিন। একটা নতুন চিৎকার শুনে ফিরে তাকাল। দেখল লাল ক্যাপ পরা ছেলেটা হাত নেড়ে ডাকছে। 'অ্যাই কিশোর, কিশোর, জলদি চলে এসো। তুমি আমাদের দলে।'

'না, আমি খেলব না।' ঘাবড়ে গেছে কিশোর। কি করে খেলতে হয়, কিছুই জানে না।

'আরে এসো না। তোমার বন্ধুটিকেও নিয়ে এসো। প্রথম ড্রেল মাত্র শুরু করেছি আমরা।'

'সরি। এখন খেলতে পারব না,' কিশোর বলল। 'অন্য জায়গায় কাজ আছে আমাদের।'

ছেলেটাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না কিশোর। দ্রুতপায়ে রাস্তা পেরিয়ে চলে এল রবিনকে নিয়ে। এখান থেকেও কানে আসছে খেলোয়াড়দের উঁচু গলার কথা। ঝগড়া মিটে গেছে।

'এই যে, আরেক মিনিয়ার। তোমার স্ক্র্যাচ।'

'ক্রিল ছোঁড়ো! ক্রিল ছোঁড়ো!'

সাইডওয়াক ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। কালো হয়ে গেছে রবিনের মুখ। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কি করব আমরা, বলো তো? যা সব কাণ্ড···উদ্ভট!'

'আমাদের জন্যে উদ্ভট। ওদের কাছে স্বাভাবিক।'

হাঁটতে হাঁটতে কয়েকটা ব্লক পার হয়ে এল ওরা। বর্গাকার বাড়িগুলোর সামনে সুন্দর করে ছাঁটা লন। একটা বাড়ির ভেতর থেকে ওদের দেখে ঘেউ ঘেউ শুরু করল একটা কুকুর।

এই প্রথম একটা স্বাভাবিক শব্দ কানে যেন মধুবর্ষণ করল ওর।

আরেকটা রাস্তা পার হয়ে এল ওরা। ছোট একটা সবুজ পার্কে ঢুকল। ফুলের ঝোপে ঢাকা থাকায় প্রায় দেখাই যায় না এ রকম একটা কাঠের বেঞ্চে কথা বলার জন্যে বসল দু'জনে।

'কি করব এখন?' রবিনের প্রশ্ন।

বার দুই ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'আগে সব কথা আমাদের মনে করা দরকার। মনে করতে পারছি না বলেই এ ভাবে বিপদে পড়ে যাচ্ছি।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'বেশ। করো।'

'তোমার পুরো নামটা মনে করার চেষ্টা দিয়েই শুরু করা যাক। চোখ বোজো। ভাবতে থাকো।'

কিশোরের কথামত কাজ করল রবিন। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর যখন চোখ মেলল, দেখা গেল তার চোখ অস্থির।

'নাহ্,' মাথা নাড়ল রবিন, 'পারলাম না। আমি রবিন। রবিনের পরে কি, জানি না। নিজের নাম মনে করতে পারছি না। কি ভয়ানক!'

ওর হাত ধরে চাপ দিয়ে আশ্বস্ত করতে চাইল কিশোর। হাতটা বরফের মত শীতল।

'দেখি তো, আমি কিছু মনে করতে পারি কিনা,' বলল সে। চোখ বুজে ভাবতে শুরু করল। ধীরে ধীরে একটা ছবি স্পষ্ট হতে লাগল মনের কোণে। ছোট একটা বাড়ির ছবি।

'মনে হয় কোথায় বাস করি, বুঝতে পারছি,' চোখ মেলে বলল সে। হাত তুলে দেখাল, 'ওই ওদিকেই কোনখানে হবে।'

'সত্যি?' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'কতদিন ধরে আছ ওখানে? মনে করতে পারছ?'

আবার চোখ বুজে ধ্যান করতে লাগল কিশোর। 'না,' চোখ মেলে বলল, 'আর কিছু মনে করতে পারছি না।'

'ওখানে কি অল্প দিন ধরে আছ, না বেশি দিন? ভাবো, কিশোর, ভাবো।'

'আসলে, আর কিছু মনেই করতে পারছি না আমি।'

'তোমার কোন ভাই-বোন আছে?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'জানি না, রবিন। কিছুই মনে করতে পারছি না।' অসুস্থ বোধ করছে সে। পার্কটা ঘুরতে শুরু করল যেন চোখের সামনে।

উঠে দাঁড়াল সে। 'চলো, যাই। বাড়িটা খুঁজে বের করি। হয়তো আমার মা-বাবাকে পাওয়া যাবে ওখানে। কি হয়েছে, ওদের কাছে জানতে পারব।'

আগের মতই বসে রইল রবিন। বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকাল কিশোরের দিকে। 'তোমার বাবা-মা'র কথা মনে করতে পারছ?'

চোখে চোখে তাকিয়ে রইল দু'জনে। বাবা-মা'র কথা মনে করার চেষ্টা করল কিশোর। মাথা নাড়ল, 'না, পারছি না।'

'ভাল বিপদে পড়েছি আমরা, কিশোর,' উঠে দাঁড়াল অবশেষে রবিন।

নীরবে হাঁটতে লাগল দু'জনে। একটা কথাও আর বলছে না কেউ। দু'জনেই গভীর চিন্তায় মগ্ন। অতীতের কথা মনে করার চেষ্টা করছে।

আশপাশটা একেবারেই অপরিচিত। ছোট একটা পাথরে তৈরি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দরজার গায়ে বইয়ের ছবি আঁকা।

'লাইব্রেরি হতে পারে,' কিশোর বলল।

বাড়ি যেতে চায় সে। দেখতে চায়, বাবা-মা কেমন।

সমস্ত প্রশ্নের জবাব চায় সে।

কিশোরের হাত চেপে ধরে টান দিল রবিন। 'চলো, ভেতরে গিয়ে দেখে আসি কিছু জানা যায় কিনা। হয়তো কোন সূত্র পাওয়া যাবে।'

লাইব্রেরিটা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত তাকগুলো বইয়ে ঠাসা। সামনের ডেস্কের পাশের একটা তাকের সামনে শুয়ে ঘুমাচ্ছে একটা কালো বিড়াল।

লাইব্রেরিয়ান একজন সুন্দরী অল্পবয়েসী মহিলা। ঘোড়ার লেজের মত করে চুল বাঁধা। ওদের দেখে আন্তরিক হাসি হাসল, 'বলো, কি সাহায্য করতে পারি তোমাদের? আমার নাম মিস টরশিয়া। তোমাদেরকে তো আগে কখনও দেখিনি।'

'নতুন এসেছি আমরা,' জবাব দিল রবিন।

'এ জায়গাটার ওপর লেখা কোন বই আছে?' জানতে চাইল কিশোর।

চোখের পাতা সরু করে ফেলল মিস টরশিয়া। 'তুমি বলতে চাইছ লোক্যাল হিস্টরি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। ভূগোলও দরকার। ম্যাপ-ট্যাপ, ওসব আরকি।'

'ওই দরজাটা দিয়ে মেইন রীডিং রুমে চলে যাও,' পেছনের একটা সরু দরজা দেখাল লাইব্রেরিয়ান। 'পেছনের দেয়ালের কাছে শেষ তাকটার ডান দিকে পাবে।'

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে দরজার দিকে এগোল দু'জনে।

'কোন প্রয়োজন পড়লে জানিয়ো,' লাইব্রেরিয়ান বলল।

মেইন রীডিং রুমটা লম্বা, সরু। ঘরের মাঝ বরাবার প্রায় ঘরের সমান লম্বা একটা টেবিল। টেবিলের দুই পাশে বসে বই কিংবা খবরের কাগজ পড়ছে কয়েকজন লোক।

ওদের পেছন দিয়ে এগিয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। লাইব্রেরিয়ানের কথামত শেষ তাকটার ডান পাশে এসে দাঁড়াল। বইয়ের নাম পড়ার জন্যে থামল না। দু'জনে দুই হাতে যতগুলো বই নিতে পারল, টেনে নামিয়ে নিয়ে এল।

টেবিলে এনে ফেলল।

শেষ মাথায় দুটো খালি চেয়ার আছে। একটাতে বসে পড়ল কিশোর। রবিনের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আশা করি, এবার জানতে পারব, কি ঘটেছে আমাদের।'

তার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল রবিন। মোটা বইয়ের স্তূপ থেকে

একটা বই টেনে নিয়ে ভারী মলাটটা ওল্টাল কিশোর। দু-তিনটে পাতা উল্টেই স্থির হয়ে গেল।

আতঙ্কিত!

'আগেই ভাবা উচিত ছিল আমাদের,' ফিসফিস করে বলে উঠল রবিন।

দুর্বোধ্য অক্ষরগুলোর দিকে বোকার মত তাকিয়ে রইল দু'জনে।

ইংরেজি বর্ণমালা নয়।

এ রকম অক্ষর জীবনেও দেখেনি ওরা। স্কুলে যে বর্ণমালা দেখেছে, এটা তা-ও নয়।

দড়াম করে বইটা বন্ধ করে রেখে আরেকটা বই টেনে নিল কিশোর। আর একটা। তারপর আরও একটা।

একটা বইতে ম্যাপ আছে। ম্যাপেরই বই ওটা। দেশগুলো সব অপরিচিত। দুর্বোধ্য অক্ষরে লেখা থাকায় নামগুলোও পড়তে পারল না।

'অর্থহীন,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন।

পাতাগুলোর ওপর আঙুল বোলাল কিশোর। ম্যাপগুলো উঁচু-নিচু হয়ে আছে। অক্ষরগুলো হাতে লাগে। ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা অক্ষরের মত।

লম্বা টেবিলটার ওপর দিয়ে সামনে তাকাল কিশোর। এতক্ষণে খেয়াল করল, সবারই চোখের পাতা বোজা। বইয়ে আঙুল রেখে অন্ধ মানুষদের মত আঙুলের সাহায্যে পড়ছে।

কারণটা কি? চোখ দিয়ে পড়তে কষ্ট বেশি হয়, সে-জন্যেই কি আঙুলের ব্যবহার? হতে পারে।

'ঠিকই বলেছ, রবিন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল কিশোর। 'অর্থহীন! চলো, বেরিয়ে যাই।'

বইটা বন্ধ করে রেখে উঠে দাঁড়াল সে। পিছিয়ে গেল টেবিলের কাছ থেকে।

চোখ পড়ল আরেকটা লম্বা ছেলের দিকে। ওদের পেছনের তাকের কাছে দাঁড়িয়ে বই ঘাঁটার ভান করছে।

ফিরে তাকাল ছেলেটা।

চিনে ফেলল কিশোর। কালো চামড়া। খুলি আঁকড়ে থাকা কোঁকড়া তারের জালের মত চুল। স্কুলের জানালা দিয়ে দেয়ালের ওপাশ থেকে উঁকি দিতে দেখেছিল একেই।

এখানে কি করছে ও? ওদের অনুসরণ করে এসেছে? নিশ্চয় কারও চর। ওদের পেছনে লাগানো হয়েছে।

রবিনের হাত চেপে ধরে টান মারল কিশোর, 'পালাও! জলদি!'

মেইন রুম থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল ওরা। দরজার দিকে ছুটল।

মুখ তুলে অবাক হয়ে তাকাল লাইব্রেরিয়ান। 'আরে আরে, কি হয়েছে...'

জবাব দেয়ার সময় নেই।
লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটে এসে রাস্তায় পড়ল ওরা।
বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা।
ছেলেটা কি আসছে?
ফিরে তাকাল কিশোর।
হ্যাঁ। আসছে।

আট

'এসো!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

রবিনের হাত চেপে ধরে টান মারল। রাস্তা পেরোনোর জন্যে দৌড় মারল দু'জনে। পেছনে গাড়ির হর্ন। ব্রেকের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

গাড়ির নিচে পড়তে যাচ্ছে কিনা, দেখারও সময় নেই।

ছোট পার্কটায় এসে ঢুকল ওরা। হাত ধরে রবিনকে একটা ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে এল কিশোর।

'ও···ছেলেটা কে?' হাঁপানোর জন্যে ঠিকমত কথাও বলতে পারছে না রবিন।

কিশোরও হাঁপাচ্ছে। 'জানি না।···তবে আমাদের পিছু নিয়েছে যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারও চর হতে পারে ও। স্কুলেও চোরের মত দেয়ালের ওপর দিয়ে উঁকি মারছিল।'

ঝোপের ফাঁক দিয়ে গেটের দিকে তাকাল সে। গেট দিয়ে ঢুকতে দেখল ছেলেটাকে।

বিকেলের রোদ পড়ছে চোখে। কপালে হাত দিয়ে রোদ ঠেকিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। কিশোরদের খুঁজছে।

খোদা! নীরবে প্রার্থনা করতে লাগল কিশোর, এদিকে যেন না আসে।

ঝোপের কাছে যেন না আসে।

এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে ছেলেটা। ঝোপগুলোর দিকে তাকাচ্ছে।

ঝোপের মধ্যে যতটা সম্ভব মাথা নুইয়ে রাখল দু'জনে।

'আসছে এদিকে?' খানিক পরে কানের কাছে ফিসফিস করল রবিন।

জবাব দিল না কিশোর। মাথা সোজা করে উঁকি দিল।

দেখল না আর ছেলেটাকে।

'চলে গেছে,' কিশোর বলল। 'অল্পের জন্যে বাঁচলাম।'

তখনই ঝোপ থেকে বেরোল না ওরা। সত্যি গেছে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আরও কয়েক মিনিট বসে রইল ঝোপের মধ্যে।

'কি করব এখন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'চলো, আমাদের বাড়িতে যাই।'

ঝোপ থেকে বেরোল দু'জনে।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে কি আমরা নিরাপদ?'

'জানি না,' জবাব দিল কিশোর।

নয়

বাড়িটা লম্বা। নিচু ছাত। সামনের দেয়াল ধূসর রঙের। জানালায় নীল কাঁচ।

গাড়ি-বারান্দায় এসে দাঁড়াল দু'জনে।

'তোমাদের বাড়ি, বুঝলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

অন্ধকার জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিল কিশোর, 'জানি না। মনে হচ্ছে আমাদেরই বাড়ি। অনুভূতি।'

গ্যারেজের ভেতরে উঁকি দিল সে। খালি। কোন গাড়ি নেই।

বাড়ির সামনের সিঁড়ি বেয়ে দরজার কাছে উঠে এল সে। জানালার কাঁচের মতই দরজার গায়েও নীল রঙ। ঠেলা দিতেই খুলে গেল। তালা নেই। ভেতরে পা রাখল সে।

'কেউ আছেন?' নিচু স্বরে ডাক দিল। জোরে ডাকতে ভয় পাচ্ছে।

নীরবতা। কেবল বড় একটা ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ কানে আসছে।

'এত তাড়াতাড়ি কি বাড়ি ফেরেন তোমার বাবা-মা?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল রবিন। তাকিয়ে আছে লিভিং রুমটার দিকে। চোখে অস্বস্তি। 'ঘরটা কি পরিচিত লাগছে? মনে করতে পারছ?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'নাহ্। শুধু মনে হচ্ছে, এখানে আমি এসেছিলাম। আর কিছু না।'

টেবিলে ফ্রেমে বাঁধানো ছবি আছে কিনা দেখল। নেই। কোন সূত্র নেই।

টেবিলের সমস্ত ড্রয়ার টেনে টেনে দেখল। ছবি নেই। কোন তথ্য নেই।

বুকে দুই হাত আড়াআড়ি রেখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। 'কি, কোন কথা মনে করতে পারছ?'

'না,' বিষণ্ন ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর।

লিভিং রুমের পেছনে ছোট আরেকটা ঘর দেখতে পেল সে। হাতের ইশারায় রবিনকে আসতে বলল।

বাদামী চামড়ায় মোড়া চেয়ার আর কাউচ আছে ওখানে। বাদামী রঙের একটা টেবিল আছে। কিন্তু এখানেও কোন ছবি নেই। বইপত্র, ম্যাগাজিন, কিছুই নেই।

এখানেও বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল রবিন। যেন বর্ম দিয়ে নিজেকে ঠেকাতে চাইছে। 'কিশোর, এ ঘরটা···' থেমে গেল সে।

ঘুরে দাঁড়াল কিশোর, 'কি?'

'এটা···আমার কাছে পরিচিত লাগছে,' দ্বিধান্বিত স্বরে জবাব দিল রবিন। ঘরের চারপাশে দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে তার। গাঢ় রঙের ওয়ালপেপারের ওপর থেকে ডেস্কের ওপর এসে স্থির হলো দৃষ্টি। 'আমার মনে হচ্ছে, এ জায়গাটায় আগে এসেছিলাম।'

'আর কিছু মনে করতে পারছ?'

দীর্ঘ ভ্রূকুটি করে রইল রবিন। তারপর মাথা নাড়ল। 'উঁহু।···কিশোর, কি মনে হয় তোমার? আমরা কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?' এক মুহূর্ত থামল। 'নাকি কোনও ধরনের পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হয়েছে আমাদেরকে?'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'পরীক্ষা?'

'হ্যাঁ। কোথায় যেন পড়েছিলাম, সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে কয়েকটা ছেলেমেয়ে দেখতে পেল অদ্ভুত এক পৃথিবীতে রয়েছে ওরা। কোথা থেকে এসেছে ওরা, কি করবে, কিছুই বুঝতে পারল না। একটা কথাই কেবল ঘুরপাক খেতে লাগল মগজে, বিপদের মধ্যে রয়েছে ওরা, বাঁচতে হবে।'

ঢোক গিলল সে। 'পরে জানতে পারল, এক ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে রাখা হয়েছে ওদেরকে। কয়েকজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখতে চাইছিল ও রকম পরিবেশে ফেলে দিলে মানুষ বাঁচতে পারে কিনা। কিংবা কতক্ষণ বাঁচতে পারে।'

'অদ্ভুত কাহিনী,' কিশোর বলল। 'তোমার কি মনে হচ্ছে···'

'হয়তো ওরকমই কিছু ঘটানো হচ্ছে আমাদেরকে দিয়ে,' রবিন বলল। 'হয়তো কোন ধরনের পরীক্ষাগারে রাখা হয়েছে আমাদের। নজর রাখছে বিজ্ঞানীরা। আমাদের প্রতিটি কাজ লক্ষ করছে।'

মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল কিশোরের। 'কি জানি, হবে হয়তো!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল, 'তাহলে কি করা উচিত এখন আমাদের? বসে থাকব চুপ করে, পরীক্ষা শেষ হওয়ার অপেক্ষায়?'

বলল বটে, কিন্তু চুপচাপ হাত গুটিয়ে যে বসে থাকতে পারবে না, সে নিজেও জানে।

রবিনের কথা যদি ঠিক না হয়? যদি কোন পরীক্ষায় না ফেলা হয়ে থাকে ওদেরকে?

'এক কাজ করা যাক,' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল রবিন। কিশোরের পেছনে তাকে রাখা ছোট একটা টেলিভিশন সেট দেখিয়ে বলল, 'ওটা অন করে দেয়া যাক। এ জায়গাটা সম্পর্কে হয়তো জানতে পারব আমরা।'

টিভিটা অন করে দিয়ে এসে কাউচে বসে পড়ল কিশোর। তার পাশে বসল রবিন। টেলিভিশনের দিকে চোখ।

কার্টুন শো চলছে। দুটো ইঁদুর একটা কুকুরকে তাড়া করছে। এ রকম অদ্ভুত কার্টুন কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না ওরা।

'চ্যানেল বদলাও,' অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল রবিন।

কাউচের পাশে রাখা টেবিল থেকে রিমোটটা তুলে নিয়ে চ্যানেল বাটনে টিপ দিল কিশোর।

আজব খেলা। অনেকটা স্কুলের ওই ডিস্ক ছোঁড়াছুঁড়ি গেমের মত। কিছুই বুঝতে পারল না ওরা।

চ্যানেলের পর চ্যানেল বদলে চলল ওরা। কোনটা থেকে যে কোনটা বেশি আজব বলা মুশকিল। একটা অনুষ্ঠানও ওদের পরিচিত নয়।

এক চ্যানেলে দেখল মাছ ধরার প্রতিযোগিতা চলছে। মোটরবোটে করে মাছ ধরছে শৌখিন মৎস্য শিকারীরা। এটা মোটামুটি পরিচিত লাগল ওদের। কিন্তু বড়শিতে মাছ উঠতেই হাঁ হয়ে গেল। মাছটার দুটো মুখ।

রিমোটের বোতাম টিপতে টিপতে এসে দেখল এক জায়গায় খবর হচ্ছে। কালো চুলওয়ালা অল্প বয়েসী একজন লোক খবর পড়ছে।

দু'চারটা টুকটাক খবরের পর সংবাদ পাঠক পড়ল: 'সরকার একটা বিশেষ সতর্ক বাণী ঘোষণা করেছে।'

কান খাড়া করে ফেলল কিশোর আর রবিন। সামনে ঝুঁকল শোনার জন্যে।

'জানা গেছে, পৃথিবী থেকে কতগুলো মানুষ এসে ঢুকেছে আমাদের শহরে। শয়তান মানুষ। ওরা কারা, এখনও জানতে পারেনি পুলিশ,' সংবাদ পাঠক পড়ল। 'সবাইকে সজাগ থাকতে বলা হয়েছে। মেয়র-গভর্নর চৌরাশিয়া শহরে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল দুই গোয়েন্দা।

পৃথিবীর শয়তান মানুষ!

জরুরী অবস্থা!

কালো সুট পরা গম্ভীর চেহারার একজন লোক দেখা দিলেন পর্দায়। কিশোরের অনুমান, ইনিই মেয়র-গভর্নর চৌরাশিয়া।

'আমরা যদি আমাদের সামাজিক দায়িত্ব যথাযথ পালন করি তাহলে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না শয়তান পৃথিবীবাসীরা,' গমগম করে উঠল মেয়রের কণ্ঠ। 'ধরা ওদের পড়তেই হবে! চরম শাস্তি পাবে শয়তানির!'

তাঁর কথার ভঙ্গিতে আবার মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ বয়ে গেল

কিশোরের।

ভয়ঙ্কর একটা ভাবনা মন থেকে দূর করতে পারছে না কিছুতেই।

এ বাড়িটা কি সত্যি ওদের?

নিশ্চিত হতে পারল না।

হয়তো এখানে বাস করে না সে। বাস করে না এ শহরের কোনখানেই।

রবিনের দিকে ঘুরল। মুখ দেখেই বুঝতে পারল একই ধরনের ভাবনা চলেছে তার মনেও।

'ওদের ভাষায় আমরাই "পৃথিবীর শয়তান মানুষ" না তো,' রবিনের প্রশ্ন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর 'মনে তো হচ্ছে। আর ধরতে পারলে যে খুন করবে তাতেও কোন সন্দেহ নেই।'

দশ

টেলিভিশন অফ করে দিল কিশোর। আর একটা শব্দও শুনতে ইচ্ছে করছে না।

হাজারও প্রশ্ন উড়ে বেড়াচ্ছে যেন মগজে।

শয়তান পৃথিবীবাসী বলা হয়েছে, তারমানে কি এ মুহূর্তে পৃথিবীতে নেই ওরা? অন্য কোনও গ্রহে রয়েছে? এখানে এল কি করে?

ওরা দু'জনই কি শুধু শয়তান পৃথিবীবাসী? নাকি আরও কেউ আছে?

ওরা কে, কি জন্যে এসেছে এখানে, যদি জানতেই না পারে, নিজেদের লুকিয়ে রাখবে কি করে?

মেয়র বলেছেন চরম শাস্তি দেয়া হবে। ধরে নেয়া যায় মৃত্যুদণ্ড। কি করেছে ওরা যে ওদেরকে হত্যা করা হবে?

রবিনের দিকে তাকাল আবার সে। 'সূত্র খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। নইলে মরা ছাড়া গতি নেই। তুমি কোথায় থাকো, সেটা কি মনে করতে পারছ? এখানে কোন বাড়ি আছে তোমাদের?'

চোখ মুদল রবিন। গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগল। 'আমি···আমি জানি না। আমি কিছু মনে করতে পারছি না, কিশোর!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'এর জবাব আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। বাঁচতে হলে জানতে হবে কি ঘটছে এখানে।'

কাউচে বসে থেকেই মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল রবিন। 'কোনখান থেকে শুরু করছি আমরা?'

'এখান থেকেই,' জবাব দিল কিশোর। 'বাড়িটার আগা-পাশ-তলা সব

খুঁজে দেখতে হবে। কিছু না কিছু নিশ্চয় আছে। কোন ছবি, ম্যাপ, বইটই। কিংবা চিঠিপত্র…'

'আমার বাবা-মা নিশ্চয় অস্থির হয়ে গেছে আমার জন্যে,' রবিন বলল। তারপর মৃদু কণ্ঠে যোগ করল, 'কিন্তু তারাই বা এখন কোথায় আছে?'

'না খুঁজলে কিছুই জানতে পারব না। এসো।' হাত ধরে রবিনকে টেনে তুলল কিশোর। খোঁজা শুরু করল।

লিভিং রূমে খুঁজেছে একবার। তা-ও আরেকবার খুঁজল।

ডাইনিং রূমে ঢুকল কিশোর। ড্রয়ার, তাক, কোন জায়গা বাকি রাখল না। ওক কাঠে তৈরি বিরাট টেবিলটার নিচেও উঁকি দিয়ে দেখল।

কিছুই নেই।

মুখ কালো করে রান্নাঘর থেকে ফিরে এল রবিন। 'রেফ্রিজারেটরে কয়েকটা ডিম আর এক কার্টন দুধ। এগুলো নিশ্চয় কোন সূত্র নয়।'

'দোতলায় চলো,' কিশোর বলল।

দোতলার প্রথম ঘরটা মনে হলো গেস্ট রূম। একটা বিছানা আর একটা শূন্য ড্রেসার। এখানেও খোঁজা হলো। কোন জায়গা বাদ না দিয়ে। এমনকি বিছানার তলায়ও। বাথরূমও বাদ গেল না।

হলের শেষ মাথার একটা ঘরে ঢুকে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি তোমার ঘর?'

ঘরটার দেয়ালে সবুজ রঙের ওয়ালপেপার লাগানো। চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর। টেবিলে রাখা একটা কম্পিউটার। বিছানায় সবুজ চাদর পাতা।

'উঁহু…পরিচিত মনে হচ্ছে না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'এখনও মনে হচ্ছে এটা আমাদেরই বাড়ি, কিন্তু…' থেমে গেল সে।

নিচু কাঠের তাকে কতগুলো ম্যাগাজিন চোখে পড়েছে। 'নিশ্চয় ওখানে রয়েছে সূত্র।'

দিল দৌড়। তাড়াহুড়া করে এগোতে গিয়ে কার্পেটের একটা ফুলে থাকা জায়গায় পা বেধে গেল।

বইয়ের তাকে কপাল ঠুকে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যথায় 'আঁউক' করে উঠল। পড়েই যাচ্ছিল, থাবা দিয়ে তাকটা ধরে ফেলে কোনমতে সামলাল। ব্যথা পাওয়া জায়গাটা ডলতে লাগল অন্য হাত দিয়ে।

মগজের মধ্যে ক্যামেরার ফ্ল্যাশের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল যেন তীব্র উজ্জ্বল সাদা আলো।

চোখ মিটমিট করতে লাগল সে। একবার। দু'বার।

'আই, রবিন…' কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'মনে পড়েছে!'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল রবিনের, 'কি?'

কপাল ডলল আবার কিশোর। 'রকি বীচ থেকে এসেছি আমি। হঠাৎ

করেই তথ্যটা ঢুকে পড়েছে মাথায়। মনে হচ্ছে তাকে কপাল ঠুকে যাওয়াতেই। আমি এসেছি লস অ্যাঞ্জেলেসের রকি বীচ থেকে।'

হাঁ হয়ে গেল রবিন। 'আর কিছু, কিশোর? ভাবো। ভাবতে থাকো। আর কিছু মনে পড়েছে?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না। শুধু এই।'

একটানে একটা ম্যাগাজিন তুলে এনে পাতা ওল্টাতে শুরু করল সে। ওটা রেখে দিয়ে আরেকটা। একের পর এক। সবগুলোই আর্ট ম্যাগাজিন। কিন্তু আর্টিস্টরা সব অচেনা। বর্ণমালাটাও ইংরেজি নয়। সেই দুর্বোধ্য আঁকিবুকি।

'নাহ্, এগুলো আমার ম্যাগাজিন নয়,' হতাশ ভঙ্গিতে হাতের ম্যাগাজিনটা ছেড়ে দিল সে। মেঝেতে পড়ে গেল ওটা।

ধপ করে বিছানার কিনারে বসে পড়ল রবিন। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'কিছুই করতে পারব না।'

আহত জায়গাটা ডলল কিশোর। গোল আলুর মত ফুলে উঠেছে। 'কোথা থেকে এসেছি সেটুকু তো অন্তত মনে করতে পারছি। এটাও কম কি।'

'তুমি আমার চেয়ে এগিয়ে আছ,' মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়তে চাইছে রবিনের। 'আমি তো কিছুই মনে করতে পারছি না। মনে হচ্ছে মগজটা একেবারে শূন্য। আমার কোন অতীত নেই। আমার কোন পরিচয় নেই।'

ওর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'আমরা হয়তো রোবট। একবার একটা রোবটের গল্প পড়েছিলাম, যেটার প্রোগ্রামিং সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। সেই রোবটগুলো হয়তো আমরাই। এ জন্যে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার গল্পটাও মনে করতে পারলে তুমি। কিংবা কোন ধরনের কম্পিউটারাইজড মানুষ আমরা। মেমোরি প্রোগ্রামে ভজকট হয়ে সব মুছে গেছে।'

বিড়বিড় করল রবিন, 'হতে পারে।'

হাতে চিমটি কাটল সে। 'আমার তো চামড়া আছে। তুমি রোবট হলেও হতে পারো, কিন্তু আমি নই। আমি মানুষ।'

কপালে ভীষণ ব্যথা। মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তা ঠিক। আমারও চামড়া। আমিও মানুষ। আমার রোবটের থিআরি ঠিক না।'

বইয়ের তাকের দিকে তাকাল সে। 'ওটাতে কপাল ঠুকে দেখবে নাকি, রবিন? তোমার স্মৃতিও হয়তো ফিরে আসতে পারে।'

ভ্রূকুটি করল রবিন। 'এরচেয়ে ভাল কোন উপায় ভেবে বের করো।'

হঠাৎ বুদ্ধিটা মাথায় এসে গেল কিশোরের। তুড়ি বাজাল। 'স্কুল!'

ওর দিকে তাকিয়ে চোখ নাচাল রবিন। 'স্কুলে কি?'

'নিশ্চয় আমাদের স্কুল রেকর্ড আছে। ভর্তি করার সময় আমাদের ফর্ম পূরণ করতে হয়েছিল। অফিসে রাখা আছে সে-ফাইল। হয়তো ইংরেজিতেই

লেখা। চলো চলো। জলদি চলো।'

দ্বিধা করতে লাগল রবিন। 'স্কুলের অফিসে চুরি করে ঢুকতে বলছ?'

জবাব দিতে যাচ্ছিল কিশোর। নিচতলায় শব্দ শুনে থেমে গেল।

নিচতলার সামনের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রবিন। চোখে মুখে ভয়। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। আরেকটা দরজা লাগানোর শব্দ হলো।

পা টিপে টিপে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। কান পেতে আছে। হলওয়েতে কোন জানালা নেই। পুরোপুরি অন্ধকার। কিছুই চোখে পড়ছে না।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ।

'ওপরে উঠে আসছে,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'লুকাও,' বলে উঠল রবিন। 'জলদি গিয়ে আলমারিতে ঢোকো।'

ঘরের আলমারিটার দিকে দৌড় দিল দু'জনে।

সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে উঠে এসেছে জুতোর শব্দ।

আলমারির ডোর নব ধরে মোচড় দিল কিশোর।

ঘুরল না ওটা। হয় তালা দেয়া। নয়তো আটকে গেছে।

মরিয়া হয়ে আবার মোচড় দিল সে।

টানাটানি শুরু করল দরজা খোলার জন্যে।

খুলল না।

আটকা পড়েছে ওরা।

ঘুরে তাকাল ঘরের দরজার দিকে।

দরজার বাইরে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে।

আলোয় এগিয়ে এল মূর্তিটা।

চমকে গেল কিশোর। সেই ছেলেটা। কালো চামড়া। মাথায় তারের জালের মত চুল।

হাসিমুখে বলল সে, 'এলে তাহলে।'

এগারো

পেছনে দরজাটা লাগিয়ে দিল সে। কিশোর আর রবিনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

আলমারির দিকে পেছন দিয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে দুই গোয়েন্দা।

দু'জনেই ভয় পাচ্ছে।

ছেলেটা কে? কি চায়?

ওদের আসল পরিচয় কি জেনে ফেলেছে? ধরতে এসেছে? এখনই হয়তো ফোন করবে পুলিশকে।

ধীরে ধীরে সামনে এগোল ছেলেটা। 'এমন করছ কেন তোমরা? আমাকে চিনতে পারছ না?'

তাকিয়ে আছে কিশোর। ছেলেটাকে কি চেনার কথা?

'আরে চিনতে পারছ না কেন? আমি মুসা। আমি তোমাদের বন্ধু।'

'আমাদের বন্ধু?' বিড়বিড় করল কিশোর। মুসা যদি ওদের দু'জনের বন্ধু হয়, তাহলে কিশোর আর রবিনও পরস্পরের বন্ধু। তার মানেটা দাঁড়াচ্ছে, তিনজনেই ওরা তিনজনের বন্ধু।

'আমাদের স্মৃতি...' কিশোর বলল। 'কিছু একটা ঘটেছে। নষ্টই হয়ে গেছে হয়তো।'

'আমি কিছু মনে করতে পারাছ না,' মুসাকে জানাল রবিন।

'আমিও না,' মুসা বলল।

'তাহলে আমাদের চিনলে কি করে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'কি জানি! ওটুকুই পারছি কেবল,' জবাব দিল মুসা।

'কিন্তু কিছু মনে করতে পারছি না কেন আমরা? তোমার কি কিছু জানা আছে?'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল সে। 'না।'

'কোথায় আছি আমরা? এখানে এলাম কি করে?'

'কিশোর, কিছুই জানি না আমি। সারাক্ষণই মনে করার চেষ্টা করছি। পারছি না। স্মৃতিটা একেবারে সাদা হয়ে গেছে। শুধু জানি, এ বাড়িটাতে থাকি আমরা। ক'দিন ধরে থাকছি, তা-ও মনে করতে পারছি না।

'স্মৃতিতে তোমাদের মুখ দুটো কেবল রয়েছে। আর ডাক নাম দুটো। কত জায়গায় যে তোমাদের খুঁজে বেড়িয়েছি। শেষে স্কুলে গিয়ে দেখা পেয়েছি। পিছু নিয়ে লাইব্রেরিতে গিয়েছি। কিন্তু আমাকে দেখে ভয় পেয়ে তোমরা পালালে।'

'তোমাকে চিনতে পারিনি,' কিশোর বলল।

'এখনই কি পারছ?'

'না। তুমি বলছ, তাই ধরে নিয়েছি, ঠিকই বলছ।'

'এ বাড়িটা কি আমাদের?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'আমাদের বাবা-মা'রা কোথায়?'

'জানি না,' মুসা জবাব দিল। 'তবে একটা কথা জানি।'

'কি?' একসঙ্গে বলে উঠল কিশোর আর রবিন।

'ভয়ানক বিপদের মধ্যে রয়েছি আমরা। তিনজনেই।'

বারো

কথা বলার জন্যে নিচতলায় লিভিং রূমের পেছনে টেলিভিশনওয়ালা ঘরটায় এসে বসল ওরা। কেউ নজর রাখছে কিনা, জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে এল মুসা । তারপর পর্দাগুলো ভালমত টেনে দিল।

রবিন আর কিশোরের মুখোমুখি চেয়ারে বসল সে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকল। দুই হাত মুঠো করছে আর খুলছে। 'টিভি নিউজটা দেখেছ?'

কিশোর আর রবিন দু'জনেই মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ। আমরাই কি পৃথিবীবাসী শয়তান মানুষ?'

ভ্রূকুটি করল মুসা। 'শয়তান কিনা জানি না। তবে আমরাই পৃথিবীর মানুষ।'

'আমাদের খুন করতে চাইছে কেন ওরা?' রবিনের প্রশ্ন। 'এখানে এলাম কি করে আমরা? অন্য কোন গ্রহে চলে এসেছি নাকি?'

একটা প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারল না মুসা। ওর স্মৃতিও একই রকম শূন্য। 'ওরা পৃথিবীবাসীদের পাকড়াও করতে চায়। কিন্তু কারা পৃথিবীর মানুষ, জানে না এখনও। না জানা পর্যন্ত আমরা নিরাপদ।'

'এখান থেকে পালানো দরকার আমাদের। এখুনি,' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'কি বলো?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'এখনও সময় হয়নি। আগে জানতে হবে নিরাপদে পালাতে পারব কিনা আমরা। সাবধানে প্ল্যান করে তারপর বেরোতে হবে। ভাবার জন্যে সময় দরকার, রবিন।'

'কিন্তু···আজ রাতে কোথায় থাকব আমরা?'

'আমার মনে হয়,' জবাব দিল মুসা, 'আজ রাতে এখানেই আমরা নিরাপদ। কালকে দিনের বেলায় স্কুলে। তবে কেন যেন মনে হচ্ছে আমার জন্যে স্কুলটা নিরাপদ হবে না। আমি খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যাব।'

'স্কুলে নিরাপদ?' চিন্তিত ভঙ্গিতে মুসার দিকে তাকাল কিশোর।

'না না, মরে গেলেও আর ওখানে ফিরে যাব না আমি···' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'আস্তে! কেউ শুনে ফেলবে,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'হ্যাঁ, মুসা ঠিকই বলেছে। স্কুলেই আমরা নিরাপদ। লুকানোর সবচেয়ে ভাল জায়গা। সবার চোখের সামনে লুকিয়ে থাকা। ঠিক আছে, তাই করব আমরা। আর মুসা, তুমি ওই সময়টায় আশেপাশে খুঁজে বেড়াবে। পালানোর উপায় খুঁজবে।'

কিশোর আর রবিনের দিকে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মুসা। 'দেখো, এমন কোনও আচরণ কোরো না, যাতে কেউ সন্দেহ করে বসে।'

'কিন্তু কতদিন এ ভাবে লুকিয়ে থাকতে পারব আমরা?' প্রশ্ন করল রবিন।

'দু'এক দিনের বেশি পারব না,' কিশোর বলল। 'এর বেশি হলে ধরা পড়ে যাব। এটুকু সময়ের মধ্যেই পালানোর কোন না কোন উপায় আমাদের বের করেই ফেলতে হবে।'

'স্কুলে ওদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে থাকতে পারবে তো?' মুসার প্রশ্ন।

ওর দিকে তাকিয়ে চুপচাপ ভাবতে লাগল কিশোর। সত্যিই। পারবে তো?

নিজের মনেই জবাবটা দিল, না, পারবে না। তবু, চেষ্টা তো করতেই হবে।

তেরো

স্কুলে নিরাপদেই কেটে গেল সকালটা। তবে কাটানোটা সহজ হলো না। অঙ্কের সমীকরণ বুঝতে পারল না আগের দিনের মতই। ভূগোলের কি যে পড়ানো হলো, তা-ও মাথায় ঢুকল না। কারণ দেশগুলোর নামই জীবনে শোনেনি সে।

সামনের একটা লম্বা ছেলের পেছনে বসেছে কিশোর। যাতে চট করে তাকে চোখে না পড়ে টীচারের। কোন প্রশ্ন করতে না পারে। কোন প্রশ্ন করলেনও না মিস্টার ডোরি।

হাতের তালু সারাক্ষণ ঠাণ্ডা হয়ে আছে। ঘামে ভিজছে। জোরে কোন শব্দ হলেই চমকে যাচ্ছে।

তবে কেউ তাকে লক্ষ করল না, জিমনেশিয়াম ক্লাসের আগে।

সারি দিয়ে জিমনেশিয়ামে ঢুকল ছেলেমেয়ের দল। আতঙ্কে অবশ হয়ে আসতে লাগল কিশোরের হাত-পা।

জিমনেশিয়াম টীচারের নাম মিস্টার লাবরাম। দেয়ালের কাছে সবাইকে সারি দিয়ে দাঁড়াতে বললেন।

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। ট্রিলথ্ গ্রেডের অন্য শাখার ছেলেমেয়েদের জন্যে। এখানে একসঙ্গে ক্লাস করবে দুটো শাখাই।

রবিনের জন্যে উন্মুখ হয়ে রইল কিশোর।

সারি দিয়ে ঢুকতে শুরু করল অন্য শাখার ছেলেমেয়েরা। রবিনকে দেখতে পাচ্ছে না কিশোর। শঙ্কিত হয়ে উঠল। রবিনের কিছু হলো নাকি?

সবার পেছনে মাথা নিচু করে ঢুকল রবিন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

'এক শাখা আরেক শাখার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে,' মিস্টার লাবরাম বললেন। তাঁর হাতে কালো চারকোনা একটা টোস্টারের মত জিনিস। 'ফার্স্ট ব্লেট কে করতে চাও?'

মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে ফেলল কিশোর। কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে তার। কেউ দেখছে না তো!

আমাকে না, খোদা! আমাকে যেন বেছে না নেয়! মনে মনে প্রার্থনা করল সে।

কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে অনুভব করল, তার কাঁধেই হাত পড়েছে মিস্টার লাবরামের। মুখ না তুলে আর উপায় রইল না। কালো জিনিসটা কিশোরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে লাবরাম বললেন, 'ফার্স্ট ব্লেট তোমার। সবাই রেডি?'

জিনিসটা বেশ হালকা আর নরম। রবারের মত। লাবরামের হাতে দেখে কিশোর মনে করেছিল ভারী।

তাকিয়ে রইল ওটার দিকে। হাতের কাঁপুনি ঠেকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

কি করবে এটা দিয়ে? কি?

তাকিয়ে দেখল, প্রতিটি চোখের দৃষ্টি এখন তার ওপর।

নিজের দলের খেলোয়াড়েরা ছড়িয়ে পড়েছে তার পেছনে। বিরোধী দলের ছেলেমেয়েরা সবাই হাঁটুতে হাতের ভর রেখে সামনে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে।

রবিনের দিকে তাকাল সে। সবগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে কেবল তার চোখেই ভয় দেখতে পেল কিশোর। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। অদ্ভুত জিনিসটা দিয়ে কি করবে কিশোর, সে-ও বুঝতে পারছে না।

ছুঁড়ে দেবে? বলের মত লাথি মারবে?

বাড়ি মারবে কারও গায়ে? কারও হাতে 'পাস' করে দেবে?

বাঁশি বাজালেন লাবরাম।

চেঁচিয়ে উঠল ছেলেমেয়ের দল।

ছোঁড়ার ভঙ্গিতে জিনিসটা মাথার ওপর তুলে নিল কিশোর।

নড়ছে না। দম আটকে ফেলেছে।

সবাই অপেক্ষা করছে। সবাই তাকিয়ে আছে।

কি করবে সে?

কি?

চোদ্দ

বরফের মত জমে গেছে যেন কিশোর। মাথার ওপর জিনিসটা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

চিৎকার-চেঁচামেচি হট্টগোল ছাপিয়ে কানে এল মিস্টার লাবরামের গলা।

'থ্রুল করেছ, কিশোর!' চিৎকার করে বললেন তিনি। 'এক থ্রুল হলো।'

আবার বাঁশি বাজল।

নড়ছে না কিশোর। ভাবতে পারছে না।

আচমকা ছুঁড়ে মারল জিনিসটা। ওটার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচতে চায়।

বোকা হয়ে দেখল, জিনিসটা উড়ে গেল রবিনের দিকে।

দুই হাতে লুফে নিল রবিন।

রাগে চেঁচিয়ে উঠল তার দলের ছেলেমেয়েরা।

'করলে কি? গ্রেল হয়ে গেল তো!'

'হার্ব করো, রবিন! হার্ব করো!'

দিশেহারা হয়ে গেছে রবিন। জিনিসটা দুই হাতে সামনে বাড়িয়ে ধরে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে।

আবার বাজল বাঁশি।

ইশারায় রবিনকে কাছে যেতে ডাকলেন লাবরাম। তারপর ডাকলেন কিশোরকে।

তাঁর শীতল চোখের দৃষ্টি কিশোরের ওপর স্থির হলো। 'ব্লেট করলে না কেন, কিশোর? ফার্স্ট ব্লেট তোমার ছিল।'

ঢোক গিলল কিশোর। মনে হতে লাগল, তার হাঁটুর কাঁপুনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সবাই। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাওয়াটা ঠেকাল কোনমতে।

'আমি···আমি খেলতে জানি না,' বলল সে।

এবং বলেই করল ভুলটা। মারাত্মক ভুল।

মুহূর্তে ঘিরে ফেলল ওকে ছেলেমেয়ের দল। সবাই চুপ। নীরবে তাকিয়ে দেখছে দু'জনকে। চোখের শীতল দৃষ্টিতে সন্দেহ।

কিশোরের একেবারে মুখের সামনে মুখটা ঠেলে দিলেন লাবরাম। 'খেলতে জানো না মানে?'

ভুল যা করার করে ফেলেছে। এখন আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই।

রবিনের দিকে তাকালেন লাবরাম। 'তোমার কি বক্তব্য? তুমিও জানো

না নাকি?'

মাটির দিকে চোখ নামাল রবিন।

পৃথিবীবাসী!

পৃথিবীবাসী!

শয়তান মানুষ!

শয়তান মানুষ!

সমস্বরে চিৎকার করে উঠল ছেলেমেয়েরা।

হাত তুলে ওদের চুপ থাকতে বলে কিশোর আর রবিনের দিকে তাকালেন লাবরাম। 'তোমরা কি ভেবেছিলে? তোমাদের ধরতে পারব না আমরা?'

দৌড় দেয়ার কথা ভাবল কিশোর। কিন্তু ঘিরে থাকা ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে সে-ইচ্ছে বাদ দিল।

পালানোর পথ নেই।

দু'জনকে প্রিনসাপলের অফিসে নিয়ে চললেন লাবরাম। পেছন পেছন চলল উত্তেজিত ছেলেমেয়ের দল।

ভেতরের অফিসে দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে গেলেন মিস্টার ক্রেটার। দরজা বন্ধ করে ছিটকানি লাগিয়ে দিলেন। ফিরে তাকালেন ওদের দিকে। চেহারা থমথমে। দৃষ্টি কঠিন।

ডেস্কের সামনে রাখা দুটো চেয়ার দেখিয়ে ওদের বসতে ইশারা করলেন। ঘুরে গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। শান্ত, মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা পৃথিবীর মানুষ?'

'জানি না। কিছুই মনে করতে পারছি না আমরা,' কম্পিত কণ্ঠে সত্যি জবাবটাই দিল কিশোর।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার ক্রেটার। 'এটা কোন গ্রহ বলতে পারবে?'

মাথা নাড়ল কিশোর।

'এখানকার সাতটা মহাদেশের নাম কি?'

আবারও মাথা নাড়ল কিশোর, 'মনে করতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে সাহায্য করছি। প্রথম দুটোর নাম প্লসিয়া ও অ্যানড্রিজিয়া। বাকি পাঁচটা কি বলো।'

একটা মুহূর্ত চুপ করে থাকল কিশোর। তারপর হঠাৎ করে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল যেন, 'আমেরিকা···আমেরিকা···' আর মনে করতে পারল না।

বরফের মত শীতল হয়ে গেল মিস্টার ক্রেটারের দৃষ্টি। 'আবার ভুল করলে তুমি, কিশোর। আমেরিকা হলো পৃথিবীর মহাদেশ। এ নামে আমাদের কোন দেশ নেই। আর আমাদের মহাদেশও সাতটা নয়। এর মানেটা কি দাঁড়াল? তুমি পৃথিবীর মানুষ।'

রবিনের দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমার কিছু বলার আছে? আমাদেরটা কোন গ্রহ, ক'টা মহাদেশ, বলতে পারবে?'

নীরবে মাথা নাড়ল রবিন। চোখ নামাল ডেস্কের দিকে।

'হুঁ!' ওপরে নিচে মাথা দোলালেন মিস্টার ক্রেটার। হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন টেলিফোনের রিসিভার। বোতাম টিপলেন।

ওপাশ থেকে সাড়া আসতেই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি প্রিনসাপল ক্রেটার। কাউকে এখানে পাঠান। পৃথিবীর দুটো ছেলেকে পাকড়াও করেছি আমরা।'

পনেরো

ফোনে কথা বলছেন মিস্টার ক্রেটার। ঘুরে দরজার দিকে তাকাল কিশোর। বেরোনো যাবে কিনা ভাবছে।

যাবে না। হুড়কোও লাগানো। ছিটকানিও তোলা।

ওগুলো খুলতে খুলতেই এসে ধরে ফেলবেন মিস্টার ক্রেটার। কিন্তু একজনকে ধরতে পারবেন। আরেকজনকে?

ওদিক দিয়ে পালানোর চিন্তাটা বাদ দিয়ে দিল কিশোর। যা-ই ঘটুক, একসঙ্গে থাকা উচিত এখন দু'জনের।

'হ্যাঁ হ্যাঁ। মেয়র-গভর্নরকেও জানাতে পারেন,' মিস্টার ক্রেটার বললেন।

রবিনের দিকে ঘুরল কিশোর। চোখের ইশারা করল।

মাথা ঝাঁকাল রবিন। বুঝতে পেরেছে।

একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে জানালার দিকে দৌড় মারল দু'জনে।

চিৎকার দিয়ে ফোনটা হাত থেকে ছেড়ে দিলেন মিস্টার ক্রেটার। চোখের কোণ দিয়ে তাঁকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখল কিশোর।

দেরি করে ফেলেছেন মিস্টার ক্রেটার।

মাথা নুইয়ে জানালা দিয়ে ডাইভ মারল দুই গোয়েন্দা।

জানালার চৌকাঠে হাঁটু লাগল কিশোরের। তীক্ষ্ণ ব্যথা উঠে গেল ওপরের দিকে।

বাইরের ঘাসে ঢাকা শক্ত মাটিতে এসে পড়ল। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে পড়ল।

রবিনকে টেনে তুলে দৌড়াতে শুরু করল। পার্কিং লটের ওপাশের নিচু দেয়ালটা লাফিয়ে টপকাল। খেলার মাঠের ওপর দিয়ে ছুটল।

পেছনে স্কুল বিল্ডিঙে জোরে জোরে ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। অ্যালার্ম বেল।

শুরু হলো হট্টগোল। দোতলার ক্লাসরুমের জানালা থেকে হাত নেড়ে ওদের দিকে দেখাতে শুরু করল একজন।

প্রাণপণে দৌড়াতে থাকল দু'জনে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' রবিনের প্রশ্ন।

'দূরে!' জবাব দিল কিশোর। 'স্কুলের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে।'

রাস্তায় সাইরেনের শব্দ চমকে দিল ওকে। এগিয়ে আসছে।

চতুর্দিক থেকে শুরু হলো সাইরেনের শব্দ।

পুলিশ?

স্কুলের দিক থেকে ছুটে আসতে দেখা গেল তিনজন গাঢ় রঙের স্যুট পরা মানুষকে। টীচার। একজন ওদের দিকে হাত তুলে দেখাচ্ছেন। তিনজনেই তাড়া করে এলেন ওদের ধরার জন্যে।

রাস্তা পার হয়ে এল ওরা। পাতাবাহারের নিচু বেড়া ডিঙাল। একটা বাড়ির সামনের আঙিনায় ঢুকে পড়ল। বাড়ি ঘুরে চলে এল পেছনে। ওদিকটায় কাঠের বেড়া। সেটা ডিঙাতে বেশ কসরত করতে হলো।

একটা গলিতে এসে পড়ল। পাকা রাস্তায় ছোটার সময় জুতোর শব্দ হতে লাগল।

মোড় পেরোল একটা। হাঁপ ধরে গেছে। আরেকটা বাড়ির পেছনের আঙিনা চোখে পড়ল।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, দেখে নিই,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। হাপরের মত ওঠানামা করছে তার বুক।

হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল রবিন।

পেছনে ছুটন্ত পায়ের শব্দ।

ভয় দেখা গেল দু'জনের চোখেই। কোথায় লুকাবে?

আবার দৌড় দেয়ার আগেই ওদের দিকে ছুটে এল একটা মূর্তি। পাগলের মত দুই হাত নেড়ে ওদের ডাকতে লাগল।

'মুসা!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

'কি হয়েছে?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'সাইরেন...'

'স্কুলে আমরা ধরা পড়ে গেছিলাম,' কিশোর জানাল। 'পালিয়েছি। আমাদের ধরার জন্যে ছুটে আসছে ওরা। তুমি এদিকে কি করছিলে?'

'খোঁজাখুঁজি। সূত্র খুঁজছিলাম।'

'পেলে কিছু?'

'না।' দ্রুত আঙিনাটার ওপর চোখ বোলাল মুসা। 'এখানে লুকানোর জায়গা নেই। এসো আমার সঙ্গে।'

রাস্তার দিকে দৌড় দিল মুসা। ওদিকে যাচ্ছে কেন, ভেবে অবাক হলো রবিন আর কিশোর দু'জনেই। কিন্তু কিছু বলল না।

কাছে চলে এসেছে সাইরেন। রাগত চিৎকার শোনা গেল পেছনে।

'একটা গাড়ি চুরি করব ভাবছি,' রাস্তার দুই মাথায় চোখ বোলাল মুসা। 'গাড়িতে করে পালাব। এদের হাত থেকে আপাতত বাঁচতে পারলে পরে ভেবেচিন্তে দেখব কি করা যায়।'

বুদ্ধিটা ভাল মনে হলো কিশোরের। এ ছাড়া অবশ্য আর কোন উপায়ও নেই। বিচিত্র চেহারার পুরোপুরি বর্গাকার কিছু গাড়ি পার্ক করা রয়েছে রাস্তার একদিকে। সবচেয়ে কাছে যেটা, সেটার কাছে দৌড়ে এসে দাঁড়াল ওরা। গাড়িটা সবুজ রঙের। চাকার রঙ হলুদ।

ড্রাইভারের দরজা ধরে টান দিল মুসা। 'তালা দেয়া।'

সাইরেনের শব্দ জোরাল হচ্ছে। কাছে চলে আসছে।

পরের গাড়িটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। এটা কালো রঙের। জানালাগুলো খোলা।

জানালা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দরজার হাতল ধরে টান দিল মুসা। খুলে গেল দরজা। ড্রাইভিং সীটে উঠে পড়ল সে। কিশোর বসল তার পাশে। রবিন গিয়ে ঢুকল পেছনে।

প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজাটা দড়াম করে লাগিয়ে দিয়ে ফিরে তাকাল কিশোর। দেখল স্টিয়ারিং হুইলের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।

স্টিয়ারিঙে গোল আংটি নেই। তার জায়গায় চারকোনা একটা বাক্স। তাতে ডজনখানেক লাল রঙের বোতাম।

'এটাই কি স্টিয়ারিং?' আনমনে বিড়বিড় করল সে। মাথা নামিয়ে ইগনিশন খুঁজতে শুরু করল। 'আগেই বোঝা উচিত ছিল, এখানকার গাড়িগুলোও অন্য রকম হবে।'

'হোক না,' কিশোর বলল। 'চালাতে তো নিশ্চয় পারবে? জলদি করো!'

জানালা দিয়ে তাকিয়ে রাস্তায় তিনটে কালো গাড়ি দেখতে পেল সে। ব্রেক কষার ফলে টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

'কিন্তু চালাব কি করে?' মরিয়া হয়ে প্যানেলের বোতামগুলো টিপতে শুরু করল মুসা।

গর্জে উঠল ইঞ্জিন। চমকে গিয়ে চিৎকার করে উঠল তিনজনে।

'গীয়ার শিফট কই?' মুসার ডান হাত পাগলের মত হাতলটা খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিছুই হাতে ঠেকল না। 'গীয়ার শিফট ছাড়া গীয়ার বদলাব কি ভাবে? কোথায় ওটা? কোথায়?'

পেল না ওটা। কন্ট্রোল প্যানেলের আরেকটা বোতামে টিপ মারল।

গাড়িটা ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করতেই 'খাইছে!' বলে চিৎকার করে উঠল সে।

পাকা রাস্তায় চাকা ঘষার শব্দ তুলে রাস্তায় উঠে এল গাড়িটা।

'গ্যাস প্যাডালও তো নেই!' চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'গতি বাড়াব কমাব

কি করে?'

সাইরেনের শব্দে কান ঝালাপালা। খোলা জানালা দিয়ে মুখ বের করে দিল কিশোর। চারটে কালো গাড়ি তাড়া করে আসছে ওদের দিকে।

'জলদি করো! গতি বাড়াও!' তাগাদা দিল কিশোর। 'আমাদের দেখে ফেলেছে ওরা।'

'কি···কি করে বাড়াব? জানি না তো!' অসহায় ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা। প্যানেলের আরেকটা বোতামে টিপ মারল।

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি। ব্রেক আটকে যাওয়ায় চাকাগুলো না গড়িয়ে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে পিছলে গেল পাকা রাস্তার ওপর দিয়ে।

সামনে ছুটে গেল কিশোরের মাথা। উইন্ডশীল্ডে বাড়ি খেল।

আরেকটা বোতাম টিপল মুসা। গর্জে উঠে চলতে শুরু করল আবার গাড়ি।

'ধরে ফেলেছে!' পেছনে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল রবিন। 'আরেকটু জোরে চালানো যায় না?'

মরিয়া হয়ে একের পর এক বোতাম টিপে চলল মুসা। 'যদি শুধু জানতাম, কোন্ বোতামটা ঠিক কি কাজ করে! বড় অসহায় লাগছে। গ্যাস পেডাল নেই। ব্রেক পেডাল নেই।'

'ধরে আমাদের ফেলবেই,' রবিন বলল। 'এসে গেছে ওরা।'

কানের পর্দায় আঘাত হানছে সাইরেনের শব্দ।

গোয়েন্দারাও থেমে নেই। তীব্র গতিতে ছুটছে রাস্তা দিয়ে। গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে মুসা।

'জোরে! আরও জোরে!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'পেছনে পড়ে যাচ্ছে ওরা!'

সামনে লাল ইঁটের একটা উঁচু দেয়াল দেখতে পেল কিশোর।

গলার কাছে উঠে এল যেন তার দমটা।

চিৎকার করতে চাইল। স্বর বেরোল না গলা দিয়ে।

মুসার বোতাম টেপার বিরাম নেই।

তীব্র গতিতে ছুটতে থাকা গাড়িটাকে সামলাতে পারছে না।

চোখের সামনে বড় হচ্ছে ইঁটের দেয়াল।

উইন্ডশীল্ডের দিকে ধেয়ে এল যেন।

গুঁতো লাগানোর ভয়ঙ্কর শব্দ হলো। কাঁচ ভাঙার ঝনঝন আর ধাতব বডি দোমড়ানোর প্রাণ কাঁপানো শব্দ।

তারপর হঠাৎ নীরবতা।

সব কিছু উজ্জ্বল লাল হয়ে গেল যেন প্রথমে। সবশেষে কালো।

ষোলো

অন্ধকারে জেগে উঠল কিশোর। চোখ মিটমিট করে কালো পর্দাটা সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল।

ধূসর আকৃতি ফুটে উঠতে থাকল চোখের সামনে। ম্লান ধূসর আলোয় কালো কালো রেখা। আরও স্পষ্ট হলো সেগুলো।

একটা জানালা।

জানালায় লোহার শিক।

পাথরের একটা দেয়াল নজরে এল। দুই হাত ছড়িয়ে টান টান করতে গেল সে। ব্যথা করে উঠল। কাঁধেও ব্যথা।

আবার চোখ মিটমিট করল সে। দপ্‌দপ্‌ করতে থাকা মাথার ভেতরটা সাফ করার চেষ্টা করল।

খোঁত খোঁত করে গলা পরিষ্কার করল। চারপাশে তাকাল তারপর।

জেলখানার মত ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে পড়ে আছে, বুঝতে অনেক সময় লাগল।

মৃদুআলোয় আরও একজনকে পড়ে থাকতে দেখল।

মুসা। মাথায় ব্যাণ্ডেজ।

দেয়াল ঘেঁষে বসে থাকতে দেখা গেল রবিনকে। সবার আগে জ্ঞান ফিরেছে তার।

কিশোরকে জেগে উঠতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর? জেলখানার মধ্যে রয়েছি আমরা, তাই না?' দুর্বল, খসখসে কণ্ঠস্বর তার।

'হ্যাঁ।'

মুসাকে নড়তে দেখা গেল। নড়েচড়ে উঠে বসল সে। ছুঁয়ে দেখল ব্যান্ডেজটা।

'ইঁটের দেয়াল...' বিড়বিড় করে বলল সে। 'গাড়ি...'

'সে-সব বাদ,' কিশোর বলল। 'কে কোথায় ব্যথা পেয়েছি, সেটা বোঝা দরকার আগে।'

'আমার হাত ব্যথা করছে,' রবিন জানাল। ছোট হাজতখানাটার চারপাশে চোখ বোলাল সে। 'এখানে কে আনল আমাদের?'

আর কিছু বলার সময় পাওয়া গেল না।

ভারী পদশব্দ কানে এল। তালা খোলার ধাতব শব্দ। খুলে গেল দরজা।

কালো ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোক ঢুকল ভেতরে। প্রহরীও হতে পারে। কিংবা পুলিশের লোক। একজন হাত ধরে টেনে তুলে খাড়া করল মুসাকে।

কিশোর আর রবিনকে ইশারা করল ওর সঙ্গী, 'অ্যাই, তোমরা এসো আমার সঙ্গে।'

'কোথায় যাব?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'এখানে নিয়ে এসেছেন কেন আমাদের?'

জবাব দিল না গোমড়ামুখো গার্ড। লম্বা, নিচু ছাতওয়ালা একটা হল ধরে নিয়ে যাওয়া হলো ওদের। গার্ডদের একজন সামনে, একজন পেছনে। পেছনের লোকটার হাত কোমরে ঝোলানো পিস্তলের হোলস্টারের ওপর থেকে সরছে না মুহূর্তের জন্যেও।

'এটা কি জেলখানা নাকি?' জানতে চাইল মুসা।

'আমরা তো এমন কিছু করিনি যে জেলে নিয়ে আসতে হবে,' কিশোর বলল।

একটা কথাও বলল না গার্ডেরা। নীরবে হেঁটে চলল ওরা। কংক্রীটের মেঝেতে ওদের জুতোর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

কিশোরের মনে হতে লাগল, অনন্তকাল ধরে হেঁটে চলেছে ওরা। মাথা ধরে গেছে। কাঁধ ব্যথা করছে।

মোড় নিয়ে আরেকটা হলওয়ে ধরে এগোল ওরা। এটারও যেন শেষ নেই। দু'ধারে বন্ধ ধাতব দরজা। অবশেষে হলুদ টাইলস লাগানো একটা রিসিপশন এরিয়ায় নিয়ে আসা হলো ওদের।

দরজা খুলে ধরল একজন গার্ড।

'ঢোকো,' আদেশ দিল তার সঙ্গী।

'কোথায় নিয়ে এলেন আমাদের?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

জবাবে তার পিঠে এক প্রচণ্ড ধাক্কা মারল গার্ড। দরজা দিয়ে গিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বাঁচল মুসা। মুসার অবস্থা দেখে ধাক্কা খাওয়ার আগেই ভেতরে ঢুকে গেল রবিন আর কিশোর।

কাঠের প্যানেল করা একটা অফিস। তিন দিকে বুক শেলফ। মেঝেতে লাল কার্পেট। ওপর থেকে খাড়া ভাবে উজ্জ্বল আলো পড়ছে একটা বড় কাঠের টেবিলে।

ওরা ঢুকতেই টেবিলের ওপাশের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন একজন মানুষ। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। ধূসর পাতলা চুল। টাকের পরিমাণই বেশি। গোলগাল, ফ্যাকাসে মুখ। ইস্পাত-কঠিন দৃষ্টি।

'এরাই পৃথিবীর মানুষ, মেয়র-গভর্নর,' জানাল একজন গার্ড।

তিন গোয়েন্দার ওপর চোখ রেখে টেবিল ঘুরে এপাশে এলেন মেয়র-গভর্নর। গার্ডদের আদেশ দিলেন, 'দরজা লাগিয়ে দাও। এরা বিপজ্জনক।'

'মোটেও বিপজ্জনক নই আমরা,' প্রতিবাদ জানাল কিশোর।

শীতল দৃষ্টি দিয়ে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন মেয়র। তারপর গার্ডদের দিকে ফিরলেন। 'পালানোর চেষ্টা করলেই মেরে ফেলবে।

বুঝেছ?'

'কি করেছি আমরা?' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'কেন এখানে এনেছেন আমাদের?'

জবাব না দিয়ে মুসার সামনে এসে দাঁড়ালেন মেয়র। ওর মাথার ব্যান্ডেজের দিকে তাকালেন। 'চালাতে জানো না, তারপরেও গাড়ি চালাতে গিয়েছিলে কেন?' জবাবের অপেক্ষায় থাকলেন না তিনি। নিষ্ঠুর হাসি ছড়িয়ে গেল মুখে। 'আমি মেয়র-গভর্নর চৌরাশিয়া। তোমার নাম কি?'

'মুসা আমান। এরা দু'জন আমার বন্ধু, কিশোর আর রবিন।'

ঘরের মাঝখানে অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে তিনজনে। পেছনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দু'জন গার্ড কড়া নজর রেখেছে। টেবিলের সামনে চারটে চেয়ার আছে। কিন্তু বসতে বললেন না মেয়র।

'এখানে কেন এসেছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমরা···আমরা সত্যিই জানি না,' জবাব দিল কিশোর।

'আমি আবার জিজ্ঞেস করছি,' শীতল কণ্ঠে, প্রায় চেপে রাখা দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথাগুলো ছুঁড়ে দিলেন মেয়র। 'কেন এসেছ এ দেশে?'

'জানি না,' আবার বলল কিশোর। 'কোন দেশে আছি, তা-ও জানি না।'

'মিথ্যে কথা বলছ,' মোলায়েম স্বরে বললেন মেয়র। লাল হয়ে যাচ্ছে তাঁর ফ্যাকাসে মুখ।

'না, মিথ্যে আমরা বলছি না!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি আমরা।'

তার কথায় কান না দিয়ে আবার প্রশ্ন করলেন মেয়র, 'কেন এসেছ?'

'বললামই তো, জানি না,' জবাব দিল কিশোর। 'রবিন ঠিকই বলেছে। তিনজনেই আমরা স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি।'

'ওসব গল্প বলে পার পাবে না,' মেয়র বলল। নরম সুরে কথা বললেও, কিশোর লক্ষ করল, দাঁতে দাঁত চেপে বসছে তাঁর। কালো হয়ে যাচ্ছে মুখ।

'কিন্তু আমি জানি, কেন এসেছ তোমরা,' মেয়র বললেন। 'অস্ত্রগুলো কোথায়?'

'কিসের অস্ত্র?' অবাক হয়ে গেল কিশোর। মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল সে। মুখ দেখেই বোঝা গেল, এ ব্যাপারে কিছুই জানে না ওরাও। 'কোনও অস্ত্রের কথা জানি না আমরা।'

ওদের একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন মেয়র। 'মিথ্যে বলে লাভ হবে না। আমরা জানি, অস্ত্রগুলো তোমাদের কাছেই আছে।'

'দেখুন,' মুসা বলল, 'কোন অস্ত্রের কথা জানি না আমরা।'

'মিথ্যে বলছি না,' কিশোর বলল।

'অস্ত্রগুলো কোথায়?' এতক্ষণে রাগ প্রকাশ পেল মেয়রের কণ্ঠে। 'আমরা জানি, আমাদের ধ্বংস করতে এসেছ তোমরা।'

'ধ্বংস?' ভুরু কুঁচকে ফেলেছে কিশোর। 'আপনারা কে, সেটাই তো জানি না আমরা। কোথায় আছি, তা-ও জানি না। এখানে কি ভাবে এলাম, বলতে পারব না।' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'বিশ্বাস করুন, মিথ্যে বলছি না আমরা।'

শীতল দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছেন মেয়র। হাতের আঙুলগুলো মুঠো করছেন আর খুলছেন। শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল।

আমার কথা কি বিশ্বাস করেছেন তিনি? ভাবছে কিশোর। বিশ্বাস না করলে কিছু করার নেই তার।

'অস্ত্রগুলো বের করে দাও,' মেয়রের সেই একই কথা। বিশ্বাস করেননি তিনি। 'যদি ভাল চাও, তো এখুনি বের করো। প্রচণ্ড যন্ত্রণা পেয়ে মরতে হবে নাহলে।'

'যন্ত্রণা?' বিড়বিড় করে প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করল কিশোর।

'নিজের ইচ্ছেয় অস্ত্রগুলো না দিলে ওগুলো বের করে নেব আমরা,' মেয়র বললেন। 'মুখ থেকে কথা আদায় করার জন্যে তোমাদের নির্যাতন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না তখন আমাদের।'

মুখ ফাঁক হলো মুসার। কথা বলতে গিয়েও বলল না।

'মুসা,' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'মেয়র কি বলছেন, তুমি কি কিছু বুঝতে পারছ? কোন্ অস্ত্রের কথা বলছেন তিনি।'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল মুসা। 'জানি না। কসম। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না...'

'হুঁ,' মোলায়েম স্বরে বললেন মেয়র, 'ভাল কথায় কাজ হবে না।' আঙুল তুলে গার্ডদের ইশারা করলেন তিনি।

ঘর থেকে বের করে আরেকটা সরু হলওয়ে ধরে ওদের নিয়ে চলল গার্ডেরা। বুক কাঁপছে কিশোরের। গলা শুকনো। ঢোক গিলতে পারছে না। এ রকম ভয়াবহ সমস্যায় জীবনেও পড়েনি আর।

নির্যাতনটা কি ধরনের হবে? মারধর করবে?

থামল গার্ডেরা। ভারী একটা ধাতব দরজা খুলল একজন।

জিমনেশিয়ামের মত বড়, উঁচু ছাতওয়ালা একটা ঘরে তিন গোয়েন্দাকে ধাক্কা দিয়ে ঢোকাল ওরা।

ঘরের মাঝখানের জিনিসটার ওপর চোখ পড়তে স্থির হয়ে গেল কিশোর। বুঝে গেছে নির্যাতনটা কি ভাবে করা হবে।

চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। ঠেকাল কোনমতে।

সতেরো

কয়েক মিনিট পর উল্টো করে ঝুলিয়ে দেয়া হলো ওদের। মাথা নিচু। ইস্পাতের তারের পাকানো মোটা দড়ি দিয়ে গোড়ালির কাছে বেঁধেছে। দড়িগুলো ঝুলছে ছাতে লাগানো পুলি থেকে।

মাথায় রক্ত নেমে যাচ্ছে। ঝাঁ ঝাঁ করছে কান। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। অসুস্থ বোধ করছে কিশোর।

অন্য দু'জনের অবস্থাও ভাল কিছু না।

পায়ের গোড়ালিতে কেটে বসছে ইস্পাতের দড়ি। তীব্র ব্যথা।

মুখ হাঁ করে দম নেয়ার চেষ্টা করল কিশোর। বেড়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি। বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে।

তার দুই পাশে ঝুলছে মুসা আর রবিন।

হাত দুটো নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে ঝুলে রয়েছে তিনজনেরই। আস্তে আস্তে দুলছে দেহ তিনটা।

নিচের দিকে তাকাতে পারছে না কিশোর। আতঙ্কিত।

মস্ত বড় একটা গর্ত। তার নিচে বিরাট চুল্লি। তাতে কয়লা দেখা যাচ্ছে। আগুন এখনও ধরানো হয়নি। তবে হবে। পুলিতে ঝোলানো তারের সাহায্যে ধীরে ধীরে নিচে নামানো হবে ওদের। জ্যান্ত অবস্থায় কাবাব বানানো হবে।

'বলো এখন,' পেছনে কোনখান থেকে শোনা গেল মেয়রের কণ্ঠ, 'অস্ত্রগুলো দেবে নাকি?'

'কি করে দেব?' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'জানলে কি আর এত যন্ত্রণা ভোগ করতে যেতাম?...সত্যি বলছি, আমরা জানি না। আপনি কি বলছেন বুঝতেও পারছি না।'

'কিচ্ছু জানি না আমরা!' যন্ত্রণায়, রাগে চিৎকার করে উঠল মুসা। 'কতবার বলব? মাথায় কি মগজ নেই আপনাদের? থাকলে নিশ্চয় বুঝতে পারতেন আমরা মিছে কথা বলছি না।'

রবিন বলল, 'দোহাই আপনাদের। আমাদের ছেড়ে দিন। আমাদের কাছে কোন অস্ত্র নেই।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন মেয়র। 'আর আমার কিছু করার নেই। সব রকম সুযোগ দিয়েছিলাম তোমাদের। তোমরা শুনলে না।'

ধীরে ধীরে নড়ে উঠল দড়ি। তেল লাগানো পুলিতে শব্দ হলো না। নিচে নামতে শুরু করল তিনটে দেহ।

ঢুকে যেতে লাগল চুল্লির মুখ দিয়ে।

'না, না, প্লীজ!' ককিয়ে উঠল রবিন।

'থামুন! থামুন!' চেঁচাতে লাগল মুসা।

কিন্তু নামা বন্ধ হলো না।

আরও কয়েক ইঞ্চি নেমে তারপর থামল।

হিসহিস করে শব্দ হলো নিচে কোনখানে। গ্যাসট্যাস ঢুকছে বোধহয়, অনুমান করল কিশোর। লাল আলো দেখা দিল কয়লার নিচে। তারমানে নিচ থেকেই গ্যাস বা ওরকম কোন কিছুর সাহায্যে আগুন ধরানোর ব্যবস্থা।

আগুন ধরতে লাগল কয়লায়। আঁচ লাগছে।

জ্বলন্ত কয়লার আঁচে ওদের পুড়ে কাবাব হতে কত সময় লাগবে? ভাবছে কিশোর। কতক্ষণ লাগবে মরতে?

কয়লায় আগুন ধরছে। শরীর বাঁকিয়ে মাথাটাকে ওপরে তোলার চেষ্টা করছে মুসা। দড়ির কাছে হাত পৌঁছানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। রবিনও চুপ নেই।

কিন্তু কিশোর কিছু করল না। বুঝতে পারছে, চুল্লির মধ্যে থাকলে কোন ভাবেই মৃত্যু ঠেকাতে পারবে না। তারচেয়ে মৃত্যুটাকে যত ত্বরান্বিত করা যায় সেই চেষ্টা করা ভাল।

উত্তাপ বাড়ছে। হাত দুটো আর ঝুলিয়ে রাখা যাচ্ছে না। পেটের কাছে তুলে নিয়ে এল কিশোর।

চুল পুড়তে শুরু করল। মাথার চাঁদিতে আঁচ লাগলে কতটা ভয়ানক যন্ত্রণা হয়, কল্পনাই করতে পারেনি কোনদিন। আজ বুঝল।

ওপরে হুটোপুটির শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারপর অনেক লোকের শোরগোল। বিচিত্র ফুট-ফাট শব্দ।

এত কষ্টের মধ্যেও অবাক হয়ে ভাবল কিশোর, হচ্ছেটা কি ওপরে? অনেক দর্শক চলে এসেছে ওদের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে উপভোগ করার জন্যে?

ঠিক এই সময় তিনজনকে অবাক করে দিয়ে উঠতে শুরু করল দড়ি। টেনে তোলা হতে লাগল ওদের।

ঘটনাটা কি!

দ্রুত ওপরে উঠতে লাগল দড়ি। বের করে নিয়ে আসা হলো ওদেরকে ঘরের বাইরে।

ঘরে সত্যিই অনেক লোক। অনেকক্ষণ ধরে নিচু হয়ে ঝুলে থাকা, তার ওপর প্রচণ্ড তাপে চোখের ওপরের চামড়া শুকিয়ে গিয়ে ঘোলাটে দেখছে সব ওরা।

টের পেল গোড়ালি থেকে দড়ি খুলে নেয়া হচ্ছে ওদের। মেঝেতে পড়ে গেল তিনজনে। বাঁধন মুক্ত।

শরীরের ওপর বহু অত্যাচার হয়েছে। ধকলটা সামলে নিতে সময় লাগল ওদের। চোখের ঘোলাটে ভাবটা কেটে গেল কিশোরের। মাথার মধ্যে ঝিমঝিমানিটাও কমল। উঠে বসল সে।

অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখতে পেল। দশ-বারোজন লোক ঘিরে রেখেছে ওদের। বনে দেখা সেই সবুজ বামনের দল। তাদের হাতে অতি আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। মাটিতে পড়ে আছে মেয়র চৌরাশিয়া আর তার দুই সহকারী। মরেও যেতে পারে। কিংবা বেহুঁশ। মোট কথা, নড়ছে না।

'ভয় নেই আর তোমাদের,' কানে এল একটা স্পষ্ট কণ্ঠ। 'আমরা দখল করে নিয়েছি এ জায়গাটা।'

ফিরে তাকাল কিশোর। দলের কিছুটা সামনে দাঁড়িয়ে আছে নেতাগোছের একজন সবুজ মানুষ। কথাটা সে-ই বলল।

'কে আপনারা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমরাও মানুষ। আমাদের জাতির নাম ট্রোল। আমার নাম ড্রেলক। পৃথিবী থেকে তোমাদেরকে আমাদের বিজ্ঞানীরাই পাঠিয়ে দিয়েছে। তোমাদের স্মৃতিশক্তি মুছে দিয়েছিল। নিশ্চিত হতে চেয়েছিল, অস্ত্রগুলো যাতে তোমরা বহন করে নিয়ে আসতে পারো।'

'খাইছে!' বিড়বিড় করে বলল মুসা। 'আবার সেই অস্ত্র!'

'অস্ত্র!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'কিসের অস্ত্র?'

'যে অস্ত্রের সাহায্যে এখানকার শয়তান মানুষগুলোকে গোলাম বানিয়ে রাখতে পারব আমরা। ইচ্ছে করলেই ধ্বংস করে দিতে পারব।'

'আপনারা ওদের ধ্বংস করতে চান কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমাদেরকে মানুষ মনে করে না ওরা!' রাগত স্বরে জবাব দিল ড্রেলক। 'অথচ কোন কিছুতেই ওদের চেয়ে কম উন্নত নই আমরা। আমাদের বুদ্ধি বেশি। ওদের চেয়ে অনেক বেশি চৌকশ আমরা। কিন্তু যেহেতু আমরা বেঁটে, চেহারা একটু অন্য রকম, ওরা আমাদের সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারের মত ব্যবহার করে। শহরে ঢুকতে দেয় না। বনে বাস করতে বাধ্য করে। আমাদের কোন গণতান্ত্রিক অধিকার নেই।'

চুপ করে রইল কিশোর। বুঝতে পারছে ড্রেলকের কথা শেষ হয়নি।

'অস্ত্রগুলো দিয়ে দাও এখন,' ড্রেলক বলল। 'পৃথিবী থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ তোমরা। ওটা পেলে আমরা ক্ষমতা দখল করতে পারব। অত্যাচার নির্যাতন বন্ধ হবে আমাদের ওপর।'

'কিন্তু···কি অস্ত্র?' মুসা জানতে চাইল। 'সত্যি বলছি। কিছুই জানি না আমরা। খানিক আগে অস্ত্র দিতে না পারাতেই মেয়র চৌরাশিয়া আমাদের কাবাব বানিয়ে মারতে চেয়েছিল।'

'এক কাজ করো,' ড্রেলক বলল। 'তোমাদের হাতের তিনটে ঘড়ি খুলে আমাদের দিয়ে দাও। আমার বিশ্বাস ওগুলোর মধ্যেই অস্ত্রগুলো ভরে দিয়েছে ট্রিউক।'

'বলেন কি?' হাঁ করে নিজের হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। 'আমার ঘড়ি? এত ছোট ঘড়িতে ওরকম ভয়ঙ্কর অস্ত্র থাকে কি করে, যেটা

দিয়ে একটা জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া যায়?'

' মুচকি হেসে ড্রেলক বলল, 'তাহলেই বোঝো, আমরা কতটা উন্নত জাতি। কিন্তু লম্বা মানুষদের যন্ত্রণায় এখানে নিজেদের গ্রহে বসে গবেষণা করারও সুযোগ পাই না আমরা। ল্যাবরেটরি তৈরি করতে গেলেই হামলা চালায় ওরা। ভেঙেচুরে তছনছ করে। শেষে বুদ্ধি করে আমাদের নেতা বলল, অন্য গ্রহে চলে যাওয়া যাক। সেই সিদ্ধান্তই নেয়া হলো। আমাদের বড় বড় বিজ্ঞানীদের পাঠিয়ে দেয়া হলো পৃথিবীতে। তাদের নেতা ট্রিউক। ওখানে অ্যারিজোনার দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে গবেষণাগার বানানো হলো। সেখানে চলল গবেষণা। মাত্র কয়েক দিন আগে এই বিশেষ অস্ত্রগুলো আবিষ্কার করেছে আমাদের বিজ্ঞানীরা। যার সাহায্যে কম্পিউটারের সফটওয়্যারের মত করে মানুষের মগজ থেকেও সব মেমোরি মুছে দেয়া যায়। ইচ্ছেমত আবার ভরেও দেয়া যায়। সেটাই করা হয়েছে তোমাদের বেলায়। আমাদের কাজে লাগানোর জন্যে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু রেখে বাকি সব স্মৃতি মুছে দেয়া হয়েছে তোমাদের মগজ থেকে। স্পেসশিপে করে তোমাদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। একটা বিশেষ বাড়িতে থাকতে দেয়া হয়েছে। স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে, যাতে তোমাদের সন্দেহ করতে না পারে লম্বা মানুষদের চর। পৃথিবী থেকে যে আমাদের স্পেসশিপ অস্ত্র নিয়ে রওনা হয়ে গেছে, এ খবর পেয়ে গেছে ওরা সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু বুঝতে পারছিল না, কাদের দিয়ে সেটা পাঠানো হয়েছে। আমরাও বুঝতে পারছিলাম না, অস্ত্রগুলো সত্যি তোমাদের কাছে দেয়া হয়েছে কিনা। সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম খুঁজে দেখার। কিন্তু যখন শুনলাম, তোমাদের ধরে নিয়ে এসেছে মেয়রের কাছে, বুঝলাম, আর দেরি করা যায় না। বাইরের গার্ডদের কাবু করে ঢুকে পড়েছি।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু এ কাজের জন্যে আমাদের বেছে নিলেন কেন আপনারা? নিজেরাও তো করতে পারতেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'না, পারছিলাম না বলেই তোমাদের বেছে নেয়া হয়েছে। সব সময়ই এখান থেকে বিভিন্ন গ্রহে যাতায়াত করে স্পেসশিপ। আমাদের শিপও লম্বা মানুষের স্পাই বীমে ধরা পড়ে যায়। সার্চ না করে তখন আর ছাড়ে না আমাদের। আমরা আনলে অস্ত্রগুলো ঠিকই কেড়ে নিত ওরা। তোমাদেরকেও দেখতে পেয়েছে ওদের স্পাই বীম, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমরাও যেহেতু ওদের মত লম্বা মানুষ, শুরুতে কিছু সন্দেহ করেনি। সন্দেহ করবে না জেনেই তোমাদের দিয়ে পাচারটা করানো হয়েছে। পৃথিবীতে আমাদের লোকেরা তোমাদের মত বুদ্ধিমান তিনটে ছেলেরই খোঁজ করছিল। করতে করতে পেয়ে গেছে। তাই তোমাদের দিয়ে পাঠিয়েছে অস্ত্রগুলো। এবং বোঝা যাচ্ছে, ভুল করেনি তারা। তোমরা এতই স্মার্ট, কিছুতেই শত্রুর হাতে পড়তে দাওনি অস্ত্রগুলো।'

'কি সেই অস্ত্র?' কিশোরের প্রশ্ন।

'তিনটা তিন রকমের অস্ত্র,' জবাব দিল ড্রেলক। 'একটা দিয়ে মেমোরি মুছে ফেলা যায়। আরেকটা দিয়ে সেটা আবার ফিরিয়ে আনা যায়। আর তৃতীয়টা দিয়ে এমন এক ধরনের সঙ্কেত পাঠানো যায়, যেটা যে কোন প্রাণীর মগজে প্রবেশ করিয়ে যন্ত্রণা দিতে দিতে পাগল করে দেয়া যায় তাকে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, তিনটে যন্ত্র একসঙ্গে যার হাতে থাকবে, সে কতবড় ক্ষমতাশালী। যে কাউকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নেয়া সম্ভব।'

চুপ করে রইল কিশোর। যন্ত্রগুলোর ভয়াবহতার কথা ভাবছে।

হাত বাড়াল ড্রেলক, 'দাও, ওগুলো খুলে দাও। ট্রোলদের হিরো হয়ে থাকবে তোমরা। চিরকাল তোমাদের মনে রাখব আমরা। অবশেষে সুদিন এল আমাদের। শয়তান লম্বা মানুষগুলোকে পরাজিত করে শান্তিতে থাকতে পারব আমরা।'

'তারমানে তোমরা তখন তাদের ওপর অত্যাচার করবে,' বলতে গিয়েও বলল না কিশোর। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এখানে, যার হাতে ক্ষমতা সে-ই অত্যাচারী। হাতের ঘড়িটা চোখের সামনে তুলে আনল সে। তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। ওকে নিচের ঠোঁট কামড়াতে দেখেই বুঝে গেল তার দুই সহকারী, গভীর ভাবনা চলেছে তার মগজে।

ড্রেলকের দিকে তাকাল কিশোর। 'সত্যি বলছেন, এত ছোট একটা জিনিসের মধ্যে এমন শক্তি ভরে দেয়া হয়েছে? আপনাদের বিজ্ঞানীরা সত্যি এত বুদ্ধিমান?'

'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না।'

'কেন হচ্ছে না?' কিছুটা রেগেই গেল ড্রেলক।

'হচ্ছে না, তার কারণ অতি সাধারণ একটা ঘড়ির মধ্যে এত শক্তি ঢোকানো সম্ভব না।'

'দেখতে চাও?' আরও রেগে গেল ড্রেলক।

'হ্যাঁ, চাই।' রাগিয়ে দিয়ে কথা আদায় করে নিতে চাইছে কিশোর।

'বেশ। দেখাচ্ছি। ঘড়ির বড় চাবিটা দিয়ে সঙ্কেত পাঠাতে পারবে। আর ছোট ছোট চাবিগুলো দিয়ে কোন একজন ব্যক্তি, একাধিক ব্যক্তি কিংবা কোন আস্ত একটা দেশকেও নির্দেশ করতে পারবে।' মেয়র চৌরাশিয়া আর তাঁর দুই সহকারীর দিকে তাকাল সে। জ্ঞান ফিরেছে ওদের। উঠে বসতে আরম্ভ করেছে। হেসে কিশোরকে বলল ড্রেলক, 'পরখটা ওদের ওপরই করে ফেলতে পারো।'

তা-ই করল কিশোর। কয়েকবার টিপেটুপেই অস্ত্রটা চালানো সহজেই শিখে ফেলল। মেয়রকে টার্গেট করল প্রথমে। বড় চাবিটায় টিপ দিতেই প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠলেন মেয়র। দুই হাতে মাথা চেপে ধরলেন। যেন যন্ত্রণায়

ছিঁড়ে যাচ্ছে তাঁর মাথা।

মুচকি হাসল কিশোর। চাবিটা ছেড়ে দিল। আবার স্বাভাবিক হয়ে গেলেন মেয়র।

ড্রেলকের দিকে তাকাল সে। 'হুঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি। বোঝা যাচ্ছে, আমার হাতের অস্ত্রটা হলো যন্ত্রণা দেয়ার। স্মৃতি ফিরিয়ে আনার অস্ত্র কোনটা?'

'হবে তোমাদের বন্ধুদের হাতের কোনও একটা,' ড্রেলক বলল। 'কেন, স্মৃতি ফেরাতে চাও?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'চাই। আমাদের স্মৃতি ফিরে এলে এখন তো আর কোন অসুবিধে নেই আপনাদের। তাই না?'

'না, অসুবিধে নেই।'

দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর, 'মুসা, তোমারটা টিপে দেখো প্রথমে। দেখা যাক, আমাদের স্মৃতি ফেরে কিনা।'

টিপ দিল মুসা। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত কাণ্ড। জাদুমন্ত্রের মত স্মৃতি ফিরে এল তিনজনের। মুহূর্তে সব মনে পড়ে গেল। ওরা কে, কোথাকার লোক।

আনন্দে, উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল মুসা আর রবিন।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'সব কথা মনে পড়ছে তোমাদের? আর কোন অসুবিধে নেই?'

না না, নেই!

সব মনে পড়ছে!

চিৎকার করে জানাল দু'জনে।

'গুড!' সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

হাত বাড়াল ড্রেলক। 'দাও এবার। খুলে দাও যন্ত্রগুলো।'

আচমকা তার ঘড়ির চাবিতে টিপ মারল কিশোর। মুহূর্তে বদলে গেল ড্রেলকের চেহারা। চিৎকার করে উঠে দুই হাতে মাথা টিপে ধরল।

আবার চাবি টিপল কিশোর। প্রায় সমস্বরে চেঁচানো শুরু করল ড্রেলকের দলের সব ক'জন ট্রোল।

ওদের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে চিৎকার করে রবিনকে বলল কিশোর, 'রবিন, মনে হচ্ছে তোমার ঘড়িটাতেই রয়েছে স্মৃতি মুছে দেয়ার অস্ত্র। দাও সবগুলোর স্মৃতি মুছে।'

ঘড়িগুলোতে অতি খুদে সুপার কম্পিউটারও বসানো আছে। কি ভাবে অস্ত্র চালাতে হয় কম্পিউটারই বলে দেয়। আনাড়ি যে কেউও সহজেই এর ব্যবহার শিখে নিতে পারে। ট্রোলদের স্মৃতি বিলুপ্ত করে দিতে পনেরো সেকেন্ডের বেশি লাগল না রবিনের।

ওদের মগজে যন্ত্রণাদায়ক সিগন্যাল পাঠানো বন্ধ করে দিল কিশোর। শান্ত হয়ে গেল ট্রোলেরা। ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল। ড্রেলকের দিকে

তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'বলুন তো, আপনার নাম কি?'

হতবুদ্ধি হয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল ড্রেলক। বিড়বিড় করতে লাগল, 'নাম...নাম...কি নাম আমার?'

'ড্রেলক,' বলে দিল কিশোর।

'ড্রেলক!' ভাবলেশহীন চেহারা সবুজ রঙের আজব মানুষটার।

বুঝতে আর অসুবিধে হলো না, স্মৃতিশক্তি সত্যিই নষ্ট হয়ে গেছে তার।

এতক্ষণে মেয়র চৌরাশিয়ার দিকে তাকাল কিশোর। 'এবার বলুন, আপনাদের কি শাস্তি দেয়া যায়? কেউই ভাল লোক না আপনারা, এটা আমার বোঝা হয়ে গেছে। অতএব শাস্তি আপনাদের প্রাপ্য।'

মেয়রের চোখে আতঙ্ক। 'প্লীজ, আর যা-ই করো, আমাদের স্মৃতি নষ্ট কোরো না।'

হাসল কিশোর। 'স্মৃতি হারানোর এতই ভয়? বেশ, তাহলে খানিক আগে আমাদেরকে যা করেছিলেন, সেটাই করব? চুল্লিটা ভালমতই জ্বলছে এখন। দেব দড়িতে পা বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে ওর ভেতর? তিনজনকেই?'

প্রচণ্ড আতঙ্কে হাত জোড় করে মাপ চাইতে শুরু করল দুই গার্ড। মেয়র চৌরাশিয়া ওরকম কিছু করলেন না। তবে মুখটাকে করুণ করে রাখলেন। শীতল দু'চোখে আতঙ্ক।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কিশোর বলল, 'একটা কথা তো এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, মিথ্যে কথা বলিনি আমরা। যন্ত্রগুলো কোথায় আছে সত্যি জানতাম না, তার কারণ স্মৃতিশক্তিই নষ্ট করে দেয়া হয়েছিল আমাদের।'

লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন মেয়র। 'আমাকে মাপ করে দাও, প্লীজ। সত্যিই আমার খুব ভুল হয়ে গিয়েছিল।'

'আপনার ভুলের জন্যে আরেকটু হলেই কাবাব হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা,' ঝাঁজাল কণ্ঠে বলে উঠল মুসা।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'দাও মাপ করে। পৃথিবীতে কি করে ফিরে যাব আমরা, সেটা নিয়ে বরং ভাবা যাক।'

বাঁচার উপায় দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুযোগটা লুফে নিলেন মেয়র, 'আমি সে ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কিন্তু এক শর্তে। আমাদের কোন ক্ষতি করবে না তোমরা।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা কাত করল কিশোর, 'ঠিক আছে, করব না। আপনি ব্যবস্থা করুন। আরেকটা কথা, কোন চালাকির চেষ্টা করবেন না। অস্ত্রগুলো কেড়ে নেয়ার কুবুদ্ধি থাকলে সেটা মাথা থেকে দূর করুন। পারবেন না আমাদের সঙ্গে। এই ট্রোলদের অবস্থা করে ছেড়ে দেব। বুঝতেই তো পারছেন, এ সব অস্ত্র যাদের হাতে থাকবে তারা কি ভয়ানক ক্ষমতাশালী।'

'না না, কোন রকম চালাকি করব না!' তাড়াতাড়ি বললেন মেয়র। দুই

সহকারীর দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠলেন, 'বসে আছ কেন হাবার মত। জলদি ওঠো। মিস্টার টরমিংকে খবর দাও।' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। 'মিস্টার টরমিং আমাদের স্পেসশিপ স্টেশনের ইনচার্জ। ক্রোলখানেকের মধ্যেই পৃথিবীতে পৌঁছে যাবে তোমরা।'

'এই ক্রোলখানেকটা আবার কি জিনিস?' মুসা জিজ্ঞেস করল মেয়রকে।

'জিনিস না। নিশ্চয় সময়ের হিসেব,' বাধা দিয়ে কিশোর বলল। 'ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে যেও না এখন আর। বিদেয় হতে পারলে বাঁচি।'

*

খুলে গেল স্পেসশিপের দরজা। সবুজ ঘাসের ওপর লাফিয়ে নামল মুসা। তার পেছনে কিশোর আর রবিন।

উজ্জ্বল রোদ।

'এটা কি আমাদের সূর্যের রোদ?' চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল রবিন। 'সত্যি পৃথিবীতে ফিরে এসেছি আমরা?'

স্পেসশিপের দিকে ফিরে তাকাল কিশোর। নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ওটার দরজা। ওদেরকে নামিয়ে দিয়েই ফিরে যাবার নির্দেশ রয়েছে পাইলটের ওপর। তা-ই করছে সে।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। পরের আধ সেকেন্ড ঝিলিমিলির মত দেখা গেল শিপটাকে। তারপর উধাও। বাতাসে মিলিয়ে গেল যেন। এত দ্রুত চলতে না পারলে গ্রহান্তরে যেতে পারত না।

রোদে ভরা সবুজ ঘাসের দিকে তাকাল কিশোর। ঝিরঝিরে বাতাস। মৃদু মৃদু দুলছে ঝোপঝাড়ের ডাল।

একটা নির্জন মাঠে ওদের নামিয়ে দিয়ে গেছে স্পেসশিপ। দূরে মাঠের কিনারে একটা বাড়ি দেখে সেদিকে পা বাড়াল তিন গোয়েন্দা।

বাড়িটার কাছাকাছি আসতে একটা মেয়েকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখল। পায়ের কাছে একটা কুকুর।

অবাক চোখে ওদের দিকে তাকাল মেয়েটা। তারপর আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমরা এখানে! ওই মাঠের মধ্যে গিয়েছিলে কি করতে?'

মেয়েটা ওদের চেনা। ওদের স্কুলেই পড়ে। নাম লিসা।

উঠে দাঁড়াল কুকুরটা। ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

'অ্যাই, চুপ!' ধমক লাগাল লিসা। 'ওরা আমার বন্ধু।' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল আবার। 'বললে না তো। ওদিকে গিয়েছিলে কি করতে?'

'প্রজাপতি ধরতে,' জবাব দিল কিশোর। 'ওদিকে প্রচুর দুর্লভ প্রজাপতি পাওয়া যায় শুনে গিয়েছিলাম।'

'পেয়েছ?'

'নাহ্।'

'তারমানে মিথ্যে খবর দিয়েছে তোমাদের,' লিসা বলল। 'ঘরে আসবে

না? এদিকে তো বিশেষ আসোটাসো না। এসেই যখন পড়েছ, এসো। চা খেয়ে যাও।'

'না, লিসা,' অনুরোধের সুরে বলল কিশোর। 'আজ টায়ার্ড হয়ে গেছি। বাড়ি ফেরারও তাড়া আছে। অন্য আরেক দিন।'

লিসাদের বাড়িটার পাশ কাটিয়ে এল ওরা। পরিচিত রাস্তায় উঠল। নিশ্চিন্ত। রকি বীচেই নামিয়ে দিয়ে গেছে ওদেরকে স্পেসশিপ।

বুক ভরে পৃথিবীর বাতাস টানতে টানতে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'ঘড়িগুলোকে কি করব, কিশোর?'

'থাক আপাতত আমাদের কাছেই। সময় করে গিয়ে অ্যারিজোনার পাহাড়ে ট্রোল বিজ্ঞানীদের খুঁজে বের করব। আমাদেরকে ভোগানোর শাস্তি ওদেরকে দিতেই হবে। তা ছাড়া ওরা পৃথিবীতে থাকলে পৃথিবীবাসীও নিরাপদ নয়। ওদেরকে এখান থেকে তাড়াতেই হবে। কাবু করতে দরকার হবে এ অস্ত্রগুলোর।'

'তা ঠিক,' গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মুসা। 'স্মৃতি মুছে দিলে, কিছু মনে করতে না পারলে, কি রকম কষ্ট হয় বুঝবে তখন হাড়ে হাড়ে।'

-: শেষ :-